লীলারহস্য
(আত্মজীবনী)

মনোমোহন দত্ত

আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

লীলারহস্য
প্রথম প্রকাশ
মনোমোহন জন্মশতবর্ষ
১৩৮৪ বাংলা

প্রকাশক
শ্রী সুধীরচন্দ্র দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, কুমিল্লা

দ্বিতীয় প্রকাশ
১০ মাঘ ১৪১২ বাংলা
তৃতীয় প্রকাশ
২৩ আষাঢ় ১৪২০ বাংলা

প্রকাশক
বিল্বভূষণ দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

শব্দ অলংকরণ
জয় কম্পিউটার (ফনি ভূষণ দেবনাথ)
২৬২/ক, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২-৭১৯১৯১২, ০১১৯৯-০৯৪১৩১
E-mail : joy95fani@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা
চার হাজার
মূল্য :
একশত বিশ টাকা মাত্র

LILARAHASYA (An Autobiography) by Monomohan Datta Published by Bilwa Bhushan Datta, Ananda Ashram, Satmora, Brahmanbaria. Price : One Hundred Twelve Taka only.

ISBN-978-984-33-7165-3
জয় কম্পিউটার ও প্রকাশনী বই নম্বর- ১৩

আমার কথা

নিয়ন্তার নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সাধারণ মানব জীবন হইতে অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে অদ্য পর্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, ইহাতে অনেকানেক শিক্ষার বিষয় দেখা যায়। তাই বলিয়া মহানুভব ব্যক্তিদের চরিতাবলীর এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম- ইহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই, বরং লীলা রসময়ের লীলা চাতুর্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাশয় ব্যক্তিদের চরণ প্রান্তে বসিতে কাহারও কোন বাধা নাই। এমতাবস্থায় আমার এই চেষ্টা অনুপযুক্ত বা অকর্তব্য মনে করি না।

যদি এই জীবন রহস্য পাঠ করিয়া এক ব্যক্তিরও মন পরিবর্তন হয় তবেই আয়াস সফল মনে করি।

কিমধিক বাহুল্যেন

মনোমোহন দত্ত

নিবেদন

শিশুকালে বাবাকে হারিয়েছি। তাঁর অকাল প্রয়াণ আমাকে ব্যথিত করে। শৈশবেই বাবার জীবনের বহু ঘটনার কথা লোকমুখে শুনেছি। বড় হয়ে যখন সেগুলো বুঝতে শিখলাম তখন বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত। নিজেকে অভাগা মনে হতো এই ভেবে যে, তাঁকে সেবা দ্বারা, কর্মের দ্বরা সন্তুষ্ট করার ভাগ্য আমার কেন হলো না।

তিনি বহু গান লিখে গেছেন, গদ্য লেখাও তাঁর আছে। কিছু কিছু গানের বই পূর্বেই ছাপা হয়েছিল। বাবার তিরোধানের পর এসব পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করতেও আমাকে যথেষ্ট সময় নিতে হয়েছে। সংসার স্বচ্ছল ছিল না, কাজেই সমস্ত লেখাকেই ছাপার হরফে রূপ দেয়া তখন সম্ভব হয়নি। এখন ভক্তজনের অর্থানুকুল্যে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে।

তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে 'মলয়া' দুই খণ্ড, 'পাথেয়', 'খনি', 'প্রেম পারিজাত', 'ময়না' এগুলো ছাপা হয়ে গেছে। কারণ এগুলো বাবা সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনা ছিল যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটেছে, জনসাধারণ যা জানতে পারেনি। তাঁর জীবনের অলৌকিক উপলব্ধির ঘটনাসমূহ জনসমক্ষে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়েই হয়তো তিনি আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ঈশ্বরের অমোঘ পরিণতি অকালে সে কাজ অসম্পূর্ণই রেখে দিল।

বাবার আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে তাঁর গুরু শ্রীশ্রী আনন্দ স্বামী বা তাঁর গুরুমাতা জয়দুর্গা দেবীর ছবি দেবার কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু আমরা তাঁদের দু'জনারই ছবি সন্নিবেশিত করলাম। বাবার ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র ছিল। যেহেতু তাঁর জীবন ঈশ্বরান্বেষণেই নিবেদিত ছিল তাই তাঁর ব্যবহার্য জিনিষগুলোর ছবি অপ্রাসঙ্গিক নয় বলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বাবার হাতের লেখার নমুনা হিসাবে পাণ্ডুলিপির কিছু অংশও এই বইয়ে যোগ করেছি। বাবার অভাগা সন্তান হিসাবে আমার তৃপ্তি এটুকু যে, বাবার লেখা পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই ছাপার হরফে রূপ দিতে পেরেছি। যারা আমার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন তাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। বাবার অধ্যাত্মজীবনের ছোঁয়া আমার জীবনে লাগেনি, আমি শুধু তাঁর কৃপা প্রার্থী। জয় দয়াময়।

আনন্দ আশ্রম

১০ই মাঘ, ১৩৮৪

শ্রী সুধীরচন্দ্র দত্ত

প্রসঙ্গ কথা

এ পৃথিবীতে যাঁরা নিজেদের সাধনালব্ধ ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা মানুষের ব্যষ্টিজীবন ধন্য করে তুলেছেন- বিধিদত্ত বিপুল প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে তাপিত মানুষের তিমিরাবৃত অন্তরলোক আলোকোদ্ভাসিত করেছেন, মহর্ষি মনোমোহন দত্ত তাঁদেরই একজন। তাঁর দিব্যজীবন স্বর্গালোকে অম্লান জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজিত। মর্ত্যের ধূলিতে সে জীবনের উজ্জ্বল দীপ্তি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনুরাগী জনসমাজের অন্তর উদ্ভাসিত করে তুলছে নিরন্তর। তাঁর আশীর্বাদ নির্ঝরিণীর ন্যায় নিয়ত মর্ত্যের বিরহ তাপিত মানুষের মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে।

'লীলারহস্য' মহর্ষি মনোমোহন দত্তের পবিত্র আত্মজীবনী। তাঁর দিব্য জীবনকাহিনীর রহস্যকথা, লীলা প্রসঙ্গ ও গুরুপ্রসঙ্গ এবং অলৌকিক অনুভূতির কথা সাধক প্রবর অতি চমৎকারভাবে বিধৃত করেছেন এ গ্রন্থে। আমার মত একজন সাধারণ ও সাধনবিমুখ মানুষকে এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বলা হয়েছে। আমি নিজেকে এ কাজের জন্য নিতান্ত অনুপযুক্ত ভেবে সংকোচ বোধ করছি। আমি জানি আমার এ ভূমিকা গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি না করে আমারই গৌরব বৃদ্ধি করবে।

'লীলারহস্য'-র মত গ্রন্থের ভূমিকার দরকার হয় না। এ গ্রন্থ আপন দীপ্তিতে প্রোজ্জল। এ গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা আমি সাগ্রহে পাঠ করেছি এবং পাঠ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। লেখার মধ্যে সরলতার ভেতর দিয়ে একটি অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি রয়েছে যা পাঠককে টেনে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। আমি যেন পলে পলে অনুভব করেছি মহর্ষির জীবন প্রবাহের স্রোতকে। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, পাঠক-পাঠিকারাও পূণ্য জীবন কথা পাঠ করে অপার আনন্দ লাভে ধন্য হবেন। যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুহলে উদ্ভাসিত হবে পাঠক হৃদয়।

পুষ্প নিজ সৌরভ সমারোহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'লীলারহস্য'ও তেমনি প্রকাশগুণে ও বিষয় গৌরবে সুধী পাঠক মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। মহর্ষি নিজ জীবন কাহিনীর সঙ্গে গুরুদেব আনন্দ স্বামীর জীবনকাহিনীও বিবৃত করে গ্রন্থটিকে পরম উপাদেয় করে তুলেছেন। একই সঙ্গে আমরা দুইটি পুতঃ জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

সাধারণতঃ গ্রন্থের ভূমিকায় বিষয়বস্তুর কিছুটা ইঙ্গিত দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। 'লীলারহস্য' গ্রন্থটি এর ব্যতিক্রম হওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ শুধু প্রাত্যহিক জীবনকাহিনীর বর্ণনা নয়- এতে আছে সাধন জীবন, অলৌকিক দর্শন ও তত্ত্বানুভূতির কথা। পাঠককে এ জিনিস উপলব্ধি করতে হবে। ভূমিকাতে রহস্য কথার ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকের কৌতুহলকে বিঘ্নিত করা উচিত হবে না।

মহর্ষি অতি চমৎকারভাবে নিজস্ব ভঙ্গীতে আত্মকথা সরল ভাষায় বিধৃত করেছেন। সাধারণ শিক্ষিতা মেয়েরাও অতি সহজে এই গ্রন্থের রসোপলব্ধি করতে পারবেন। সাধক মনোমোহন দত্ত আশৈশব স্বভাব কবি। গ্রন্থের সর্বত্র সে স্বাক্ষর রয়েছে। আজকাল বেতার, টেলিভিশনে মনোমোহন সঙ্গীত গীত হচ্ছে। এ সঙ্গীত মাধুর্য শত সহস্র শ্রোতার হৃদয় মন আলোড়িত করছে। গ্রন্থের আগাগোড়া কবি-সাধকের গীতরস ধারাটি বিচরণ করেছে।

এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ভূমিকাটি যেমন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি- আমার মত অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা তা কি করে সম্ভব। আমি প্রার্থনা করি মহর্ষির আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবনে শান্তি বর্ষণ করুক। এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ সকলের পাঠ করা উচিত মনে করি।

॥ জয় দয়াময় ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বোধনষষ্ঠী, ১৩৮৪ বাংলা

শ্রী হরলাল রায়
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ

মনোমোহন মরমী সাধক ছিলেন, কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন, ছিলেন সমাজ সংস্কারকও। প্রচলিত হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রীতি-নীতির বিরুদ্ধে, উঁচু-নীচুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মনোমোহন ছিলেন অকুতোভয় এক বিদ্রোহী সাধক। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'- এই কথাকে অন্তরে অনুভব করে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের কল্যাণার্থে, জগতবাসীর অন্তরে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোমোহন তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই উপমহাদেশে বহমান সমন্বয়বাদী ধারার অন্যতম ধারক ছিলেন মনোমোহন। অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালিত এই গৃহী সাধু তাঁর সৃষ্টি, তাঁর জীবনবোধ ও কর্ম এবং প্রাত্যহিক জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

মনোমোহন একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষও যে অসাধারণে রূপান্তরিত হতে পারেন, মহাঋষিতে পরিণত হতে পারেন- তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনোমোহন। তিনি নিজেই একথা তাঁর বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ করলে যে কোনো মানুষই চমৎকৃত হবেন, উপকৃত হবেন। পাঠক জানতে পারবেন একজন মানুষ হৃদয়ে কেবল 'গুরু সত্য'- এই অমোঘ বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে সাধন ভজনের মধ্যদিয়ে ধাপে ধাপে একটার পর একটা স্তর অতিক্রম করে একজন মহামানবে পরিণত হয়েছেন, ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়েছেন, জ্যোতিস্মান হয়েছেন।

তাঁর আত্মজীবনীতে একটা অংশ জুড়ে আছেন তাঁর গুরু মহারাজ আনন্দ স্বামী বা আনন্দচন্দ্র নন্দী। মনোমোহন গুরু সান্নিধ্যের কথা বলতে গিয়ে গুরুদেব এবং গুরুদেবের পিতা সম্পর্কে যেসব অজানা কথা লিখে রেখে গেছেন- সেসব মানব সমাজের এক পরম পাওয়া।

মনোমোহনের জীবন ছিলো বড় বিচিত্র। তাঁর জীবনের গতি বারে বারেই বাঁক নিয়েছে। পরিবার স্বচ্ছল ছিলো না। ফলে, জীবিকা অন্বেষণে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত, তারপর আর এক প্রান্ত। কিন্তু কোথাও কিছু হয়নি, স্থিত হতে পারেননি তিঁনি। 'দয়াময়' বোধ হয় মনোমোহন-এর এই ছুটাছুটি দেখে মনে মনে

হেসেছেন আর বলেছেন, তোকে তো আমাতেই ফিরতে হবে। তিনি ফিরেছেন, আপন ঘরেই ফিরেছেন। তিনি 'ধর্ম ধন' উপার্জন করেছেন- যে ধনের কাছে জগতের সকল ধন পরাস্থ হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা দেখতে পাবো তিনি তাঁর আত্মকথা ১৩১০ বাংলা পর্যন্ত বিবৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এ পৃথিবীতে আরো ছ' বৎসর কাল লীলা রসময়ের লীলারহস্যের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছুতে প্রয়াস পেয়েছেন। আমার বিবেচনায় এই সময় কাল মনোমোহন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই সময়কালের কথা, ধর্মের কথা, নতুন নতুন তত্ত্বযোগের কথা তাঁর কাছ থেকে জানতে পারিনি।

তাঁর বাকি জীবনের কথা কেন তিনি লিখলেন না বা লেখার সময় সুযোগ পেলেন না-এ সম্পর্কে তিনি কিছু লিখে রেখে গেছেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু তারপরও তিনি জগতবাসীকে যেটুকু দিয়ে গেছেন, রেখে গেছেন-তার মূল্যও কি কম ? আমি বলবো, না। তিনি যেটুকু দিয়ে গেছেন তা আমাদের কাছে, গোটা জগতবাসীর কাছে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবেই বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি তখন আমার পিত্রালয় কসবা থানার মেহারী গ্রামে। পিতা শ্রী ভুবনমোহন দাশগুপ্ত এ সময় ত্রিপুরা স্টেটের নায়েব ছিলেন। আমি ছিলাম পিতামাতার প্রথমা কন্যা। আমার বয়স তখন আট বৎসর। এ সময় এক ফকির আমাদের গ্রামে এসে গান ধরলেন-

'হরি বলে ডাকরে ও মন গুরু বলে ডাক,
দিবা নিশি ভাবে বসে চরণ তলে পড়ে থাক।'

অনেকেই সে গান শুনলেন। আমিও কৌতুহল বশত ফকিরের কাছে গিয়ে সে গান শুনেছিলাম। গান শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই কয়েক ফোটা অশ্রুজল গণ্ড বেয়ে পড়েছিলো। কিছুই বুঝিনা তখন। গান শেষে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কার গান ? ফকির জানালো মনোমোহন সাধুর। সেই প্রথম আমি মনোমোহন- এর নামের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তখন কি আমি ভেবেছিলাম, আমাকেই বধূ বেশে সাতমোড়া আশ্রমে আসতে হবে ? আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখনই মনোমোহন সাধুর একমাত্র পুত্র শ্রী সুধীরচন্দ্র দত্ত- এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

এরপর শুরু হলো আমার পথ চলা। প্রথমে স্বামীর কাছ থেকে তারপর আমার প্রাণপ্রিয় শাশুড়ী সৌদামিনী দত্ত- এর কাছ থেকে মনোমোহন সম্পর্কে জানতে শুরু

করলাম। সেটা ছিলো আমার প্রাথমিক পাঠ। তারপর তো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি। এই দীর্ঘ পথ চলার মধ্যদিয়ে সবকিছু জানতে চেষ্টা করেছি হৃদয় মন সর্বস্ব পণ করে। আজকে মনোমোহন সম্পর্কে যে দু'চার কথা বলতে পারলাম, সেটা তো দয়াময়েরই ইচ্ছা প্রসূত।

'লীলারহস্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বইয়ের আঙ্গিকগত সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। অধ্যায় বিন্যাসেও পাঠক কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। বানানের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রমিত বানান রীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রজন্মের কথা বিবেচনায় এনে। তবে সকল ক্ষেত্রে এই রীতি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়েছে- এমন দাবি আমরা করবো না। তবে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না।

বর্তমান গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের মতো কষ্টসাধ্য কাজ এবং সার্বিক মুদ্রণ তত্ত্বাবধান করেছে মনোমোহন ভক্ত ড. সুকুমার বিশ্বাস। মুদ্রণ ও অন্যান্য কাজের সঙ্গে আর যারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলো তারা হলো- আনন্দ দেবনাথ, অলকা দত্ত এবং তপন দাস। দয়াময় তাদের মঙ্গল করুণ। জগতবাসী শান্তি লাভ করুক।

॥ জয় দয়াময় ॥

আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া
১০ মাঘ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

কমলারানী দত্ত

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ

মহর্ষি মনোমোহন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে সাধক, কবি ও উচ্চস্তরের দার্শনিক ছিলেন। **'সবার উপরে মানুষ সত্য'** –এ মতবাদে প্রতিষ্ঠিত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের বাণী আজীবন প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর রচিত লীলারহস্য তারই শ্রীহস্তে লিখিত পবিত্র অসমাপ্ত আত্মজীবনী।

'গুরু সত্য' এই মূলমন্ত্রই মহর্ষির জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল। শুধু তাই নয় এই অবলম্বনেই তিনি সাধক জীবনে সিদ্ধি লাভ করে অমর হয়ে আছেন। পাঠকমাত্রই মহর্ষির এই আত্মজীবনী পাঠে চমকৃত ও উপকৃত হবেন আশা করি। এই সংস্করণে নূতন কোন সংযোজন বা বিয়োজন নেই। ধারাবাহিকভাবে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ।

এই সংস্করণ মুদ্রণে সহায়তা করার জন্য জয় কম্পিউটারের স্বত্বাধিকারী ফনি ভূষণ দেবনাথকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। দয়াময় তার মঙ্গল করুন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে প্রুফ সংশোধন কর্মে সহায়তা করেছেন আমাদের গুরুভ্রাতা অধ্যাপক ননী গোপাল সেন (অবসরপ্রাপ্ত)। এ কাজে বিশেষ উদ্যোগী দয়াময় ভক্তবৃন্দ– শ্রী জয়দেব বর্মন, শ্রী চুনীলাল সাহা (নারায়ণগঞ্জ), শ্রী আনন্দ দেবনাথ এর নাম উল্লেখযোগ্য। দয়াময়ের আশীর্বাদ তাদের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল ভক্তবৃন্দের উপর বর্ষিত হোক।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন সত্বেও মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেজন্য আমি দুঃখিত।

২৩ আষাঢ় ১৪২০ বঙ্গাব্দ
আনন্দ আশ্রম, সাতমোড়া
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিল্বভূষণ দত্ত
অধ্যক্ষ
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সূচিপত্র

ওঁ

মঙ্গলাচরণ

বিধানের যিনি বিধি, নির্দ্দিষ্টের যিনি নিয়তি, অন্তরের যিনি আলোক, কর্ম্মের যিনি কারণ সেই লীলা রসময় অনন্তব্যাপী পরমানন্দ পরম জ্যোতিকে নমস্কার। এই অনন্ত বিশ্ব নানা ছন্দে গ্রথিত একটি মহাকাব্য, আমরা প্রত্যেকে তাহার একটি ছন্দ, কবি স্বয়ং ভাব-ব্রহ্ম, অনন্ত লীলারহস্য যাহা উদ্বোধন করাইয়া দিতেছে সেই মহান আনন্দ শিবস্বরূপ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

॥ ১ ॥

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চ নাসীৎ
তদিদং সর্ব্বম সৃজৎ তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ।

এক পরং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য আর কিছুই ছিল না,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালে একমাত্র তাহারই সত্ত্বাতে
কারণ এবং কার্য উভয় নিহিত, তাঁহারই ইচ্ছা কার্য করিতেছে
এবং সকল শক্তিই তাঁহার।

॥ ২ ॥

সোকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েঃ ইতিসতপোৎতপ্যত
সতপঞ্চপ্তা ইদং সর্ব্বম সৃজত যদি দং কিঞ্চ।
– তৈত্তেরিয় উপনিষদ।

বহু হয়ে জনমিব সেই ইচ্ছা করি
আত্ম তপে তপ্ত হয়ে সগুণত্ব ধরি
এ সমস্ত যাহা কিছু নিখিল ভুবন
স্ব ইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিল সৃজন।

॥ ৩ ॥

ছন্দাংসি বৈ বিশ্ব পর্ণানি
তিনি বহু ছন্দ হইলেন।

॥ ৪ ॥

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি
এই সমস্তই ব্রহ্ম ব্রহ্মেতে জনিত
ব্রহ্মে নিমজ্জিত বিশ্ব ব্রহ্মেই পালিত

॥ ৫ ॥

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্বেব
খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে। আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তীতি।
সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।

আনন্দই ব্রহ্ম ইতিতত্ত্ব জ্ঞানোদয়
আনন্দসম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়
আনন্দে সঞ্জাত ভূত, আনন্দে জীবিত।

চরমে পরম গতি আনন্দে মিলিত
ব্রহ্ম বিদ্যা এই বিদ্যা ভার্গবী বারুণী
পরম ব্যোমেতে হন প্রতিষ্ঠিতা ইনি।

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ
পূর্ব্বং হি ব্রহ্মণা সৃষ্টং কর্ম্মাভির্বর্ণতাং গতম্

ছিল না বর্ণের ভেদ ছিল সব ব্রহ্মময়
ব্রহ্মার এ পূর্বসৃষ্ট কর্মে ক্রমে জাতি হয়

শূদ্রে চ যদ্ভবেল্লাক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রৌ ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মনো ব্রাহ্মনোপচ।

শূদ্র বংশে জাত হয় ব্রাহ্মণ লক্ষণ
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ বংশে শূদ্রের মতন
শূদ্র নহে শূদ্র তবে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ
লক্ষণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে গণণ
তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষ মনুষ্যেদ্বিহ জন্মত।
তপোবীর্য্য প্রভাবেতে উৎকর্ষাপকর্ষ লাভ
যুগে যুগে মানুষেতে, রয়েছে স্বভাব
দোষ গুণে হয় শুধু জাতিগত ভেদ
নতুবা ব্রক্ষাণ্ডময় অভেদ অভেদ।

কর্ম সূত্র ঃ
মানব পুতলী বাঁধা তায়
কত নাট্য হয় অভিনীত,
তুমি আছ নেপথ্যে যে জানিতে না পায়
সেই ভাবে পুতলী ক্রিয়ান্বিত।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্

তুমি পরম যত্ন সর্ব্বান্তকরণের সহিত সেই
পরমেশ্বরকে স্মরণ লও তবেই তাহার প্রসাদাৎ
সেই শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ
করিতে পারিবে।

বংশাবলী

পিতৃদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, সোনার গাঁ ভট্টগ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্র বৈদ্য বংশজ রাজবল্লভ দত্ত নামীয় মহাপরাক্রশালী এক জমিদার ছিলেন। তখনকার আমলে জমিদারদের যুদ্ধের সময় বাদশাহী প্রথায় সৈন্য সামন্ত যোগাইতে হইত, সেমতে বহু সংখ্যক পাইক, অশ্বারোহী ক্ষমতানুসারে জমিদারগণ নিজ নিজ অধীনে রাখিতেন, এতজ্জন্য তাহাদিগকে সাজওয়াল বলা হইত। তৎকালীন সোনার গাঁ অঞ্চলে রাজবল্লভ দত্ত অতি প্রতাপান্বিত প্রধান সাজওয়াল ছিলেন।

তাহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মে- একজনের নাম রমাবল্লভ দত্ত সাজওয়াল, দ্বিতীয় রামবল্লভ দত্ত সাজওয়াল। পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর একত্রে থাকিয়াই শাসন সংরক্ষণ করিতেন, কালক্রমে বিপন্ন হইয়া উক্ত রমাবল্লভ দত্ত সিঙ্গুলা গ্রামে ও রামবল্লভ দত্ত সাতমোড়া বর্তমান বসত ভদ্রাসনে চলিয়া আসেন।

সিঙ্গুলার বাড়ীতে রমাভল্লভ দত্তের বংশপর্যায় বিশেষ প্রতাপ ও সম্মানের সহিত বর্তমান সময় পর্যন্ত মহিচাইল পরগনায় জমিদারী স্বত্বে সত্ববান হইয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন এবং অনেক উচ্চ রাজকীয় কর্মলাভে জীবন গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতে পারি নাই এবং জানিতে চেষ্টাও করা গেল না যেহেতু এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য আমার আত্মজীবন চরিত বিবৃত করা মাত্র।

সাতমোড়া গ্রামে বসতি স্থাপন

বর্তমান সময়ে আমাদের যে ভদ্রাসন বাটী আছে- উত্তর সীমানায় খাল, পূর্ব সীমানায় খাল, দক্ষিণ সীমানায় গোপাট, পশ্চিম সীমানায় গোপাট, ইহার মধ্যে এক দ্রোণ সাড়ে সাত কানি জমিতে পূর্ব সময়ে ফতে মামুদ নামে বিশেষ অবস্থাসম্পন্ন কোনও ভদ্র মুসলমান ছিলেন। তিনিই বাড়ীর পশ্চিমের পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার পাড়ে বাগিচা করেন, পশ্চিম পাড়ের আম গাছ তেতুল গাছ এবং পশ্চিম-উত্তর কোণে হিজল গাছ তাঁহারই সময়ের রোপিত, অদ্য পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া পুরাবৃত্ত উত্থান-পতন স্মৃতি জাগাইতেছে।

প্রবাদ- উক্ত ফতে মামুদের মা নাকি বড়ই বিশ্বাসী, ধার্মিক, দয়ালু এবং সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিলেন। পুষ্করিণীতে যে সকল পাড়ার মেয়েছেলে জল নিতে আসিত তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিতেন এবং দৈবক্রমে যদি কাহারও কলসী ভাঙ্গিয়া যাইত তাহাকে কলসী দিয়া দিতেন, বস্ত্রহীনাকে বস্ত্র দিতেন এবং পাড়া প্রতিবেশীর অভাব অভিযোগ সর্বদা সাধ্যানুরূপ পূরন করিতেন এবং নিজ পুত্র ও পুত্রবধুকে তদনুরূপ উপদেশ দিতেন ও সর্বদা ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। কালক্রমে উক্ত বৃদ্ধার মৃত্যু হইলে ফতে মামুদ এবং তাঁহার স্ত্রীও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন, তাহার অব্যবহিতকাল পরেই রামবল্লভ দত্ত সাজওয়াল সাতমোড়াতে আসিয়া বর্তমান বসত বাটী দখলক্রমে বসতি করিতে থাকেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র সন্তান জন্মে- তাঁহার নাম কানুবল্লভ দত্ত, তাঁহার পুত্র শুকদেব দত্ত, তাঁহার পুত্র রঘুরাম দত্ত, তাঁহার পুত্র মুলূক চাঁদ দত্ত। তাঁহারা কি অবস্থায় জীবন যাপন করেন বিশেষ কোনও বিবরণ প্রকাশিত নাই।

উক্ত মুলুকচাঁদ দত্তের তিন পুত্র- প্রথম রামহরি দত্ত, দ্বিতীয় সুধারাম দত্ত, তৃতীয় দুর্গারাম দত্ত। রামহরি দত্ত সিভিল কোর্ট জরিপ আমিন ছিলেন। তিনি আমাদের এই অঞ্চল সর্বত্রই জরিপ করেন। সেই সময়ে গ্রামে পাল বংশীয়দের অবস্থা সাধারণ মত ছিল, কিন্তু রামহরি দত্ত অতি প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি পালেদের অন্দর মহল জোরজব্বরে জরিপ করিয়া আনেন। প্রবাদ- সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তৎকালীন বৃদ্ধ পাল বংশধর চাপড়াইয়া বালিশ চিরিয়া তুলা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

উক্ত রামহরি দত্ত অনেক জমিন দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর দিয়া যান এবং নিজ নামে অনেক দেবোত্তর ভোগোত্তর রাখেন, তৎকালীন অবস্থা বড়ই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। সেই সময়ে কি কারণে কেন জানি একজন ব্রাহ্মণকে সিন্দুকের ভিতর সাত দিন পর্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে সুধারাম দত্ত সেই কথা জানিতে পাইয়া সিন্দুক খুলিয়া অতি যত্নের সহিত ব্রাহ্মণকে আহারাদি করাইয়া নূতন বস্ত্রাদি দ্বারা যৎপরোনাস্তি মনস্তুষ্টি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহাতে রামহরি দত্তকে নাকি নির্বংশ হইবার অভিশাপ প্রদান করেন ও সুধারাম দত্তকে অভয় প্রদান করেন। দুর্গারাম দত্ত নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

রামহরি দত্তের তিন পুত্র ছিল। সুধারাম দত্ত হারিসিঙ্গা বারদীর প্রসিদ্ধ নাগ বংশে বিবাহ করেন, তাঁহার দুই পুত্র ছিল।

রামহরি দত্তের প্রথম পুত্র রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, দ্বিতীয় পুত্র রাজকৃষ্ণ দত্ত, তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র দত্ত। সুধারাম দত্তের প্রথম পুত্র ভোলানাথ দত্ত, দ্বিতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ দত্ত

আমার পিতামহ। রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তৎকালে পারসি ও আরবি ভাষায় অতিশয় পারদর্শী হইয়া অতিশয় সম্মানের সহিত নাজিরের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং গোতাউড়া কালীকচ্ছের প্রসিদ্ধ নন্দী বংশে কৃষ্ণচরণ নন্দী দারোগার ভগ্নীকে বিবাহ করেন। রাজকৃষ্ণ দত্ত বাড়িতেই থাকিতেন, তিনি সাটিরপাড়া পাল বংশে বিবাহ করেন। রামচন্দ্র দত্তও লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের সময় দারোগার পদ প্রাপ্ত হন এবং কুড়িঘর উৎকৃষ্ট শাণ্ডিল্য দাতা গোপীনাথ রায়ের বংশে বিবাহ করেন।

এদিকে ভোলানাথ দত্ত আরবি, পারসি ও বাংলা ভাষাতে অভিজ্ঞ হইয়া থুল্লার থানাতে দারোগা হন এবং ভোলাচং চৌধুরী বংশে শিবনারায়ণ চৌধুরীর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে প্রবাদ শোনা যায়, চৌধুরী বংশ এই বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে ভোলাচং হইতে সাতমোড়া পর্যন্ত হাতে হাত ধরিয়া পাইক খাড়া করা হইয়াছিল, তাহাতে ভয়প্রাপ্ত হইয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে মেয়ে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং অতি সমারোহের সহিত নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পাদন হইয়াছিল। এই বিবাহের নজর এত টাকা হইয়াছিল যে, ওই উদ্বৃত্ত নজরের টাকা দ্বারা তখন বাড়ির দক্ষিণের পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ দত্ত বাড়িতে থাকিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং অবিবাহিত অবস্থাতেই নৌকাপথে একবার কাশী যাত্রা করেন, সেইস্থানে বিশ্বেশ্বরের বাড়ির সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড বলীর্বদ্দ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বড়ই কষ্ট দেয়। তৎপর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি বেশী বয়সে কেন্দুয়ায় মজুমদার বংশে গোপীনাথ মজুমদারের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

ঐ মেয়ের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি অতিশয় পরমাসুন্দরী ছিলেন। কেন্দুয়া ত্রিপুরা মহারাজের জমিদারীর অধীনস্থ অতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম। একদিন রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মৃগয়া করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মজুমদার বাড়ির নিকট দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ অবিবাহিতকালে আমার পিতামহীকে দেখিতে পান ও তখন পরিচয় জানিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। পরে ঐ মেয়েকে নেওয়ার জন্য অতিশয় যত্ন করিতে থাকেন এবং তৎকালীন মজুমদার বংশীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অনেক প্রলোভন প্রদর্শন করেন ও পরে কিছুতেই স্বীকার না আসাতে জোরজব্বর করিবার উপক্রম করেন। এমতাবস্থায় মজুমদার বংশের অভিভাবক নানা উপায়ে মহারাজাকে উপদেশ দিয়া এই চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন ও পরে বৈদ্যনাথ দত্তের নিকট বিবাহ দেন। বিবাহ সময়েও বয়স অতি অল্প ছিল, আমার পিতামহ প্রায় প্রৌঢ় অবস্থায় বিবাহ করেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত অনেক অর্থ উপার্জন করেন এবং দেশে আপামর সাধারণ সকলের নিকটই যৎপরোনাস্তি সম্মান লাভ করেন। রাজকীয় কর্মেও যশ লাভের ত্রুটি ঘটে নাই।

নাম প্রতিষ্ঠা চারিদিকে ব্যাপৃত হইয়াছিল। অতুলনীয় প্রতিভা বলে সর্বত্র পরিচিত হইয়া অনেক বড় বড় সমারোহ ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্পন্ন করেন। এমন কি তৎকালে দুর্গোৎসবে দত্ত বাড়িতে যেরূপ সমারোহ এবং প্রসাদ সন্দেশ মণ্ডা মিঠাই বিতরণ হইত, এরূপ গ্রামে কি নিকটবর্তী গ্রামে আর কোথাও হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রায় বৃদ্ধ বয়সে পেনসন নিয়া তিনি বাড়িতে আসেন। তাহার একমাত্র কন্যা ছিল, ময়মনসিংহ মুসুরদিয়া করগায়ে সেই কন্যা দত্ত বংশে বিবাহ দেন। পরে জানা গেল সেই কন্যার মাত্র এক মেয়ে, সেই মেয়েটিও অকালে বিধবা হইয়াছে।

এদিকে নজির রাজেন্দ্র দত্ত বাড়ি আসিয়া বাউচাইল জোয়ার তালুক খরিদ করিবার জন্য ও বাড়িতে দালান দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। শ্রীকাইল নিবাসী আমাদের কুলপুরোহিত জনৈক দুষ্ট ব্রাহ্মণের পরামর্শে পরে নিবৃত্ত হয়েন। ব্রাহ্মণটি এই বলিয়া তোষামোদের সহিত বলেন যে, আপনার পুত্র সন্তানাদি কেহ নাই, যাহাই করেন মাত্র জ্ঞাতিরা তাহার ভোক্তা হইবে। এই রকম প্ররোচনায় তিনি ক্ষান্ত আছেন এমত সময়ে গোতাউড়া নিবাসী তাহার শ্যালক কৃষ্ণচরণ নন্দী এখানে আসিয়া ভগ্নীর (নাজিরের স্ত্রী) সহিত পরামর্শ করিয়া গোপনে এগার হাজার টাকার মোহরপূর্ণ বাক্স চুরি করিয়া লইয়া যায়। কিছুকাল পরে তালাস করিয়া খোঁজ না পাওয়াতে রাজেন্দ্র দত্ত একরকম পাগলের মত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ দত্ত সর্বদা বাড়িতে থাকিতেন। তিনি অতিশয় শক্তিশালী, দাম্ভিক ও পেটুক লোক ছিলেন, মানুষকে অযথা গালিগালাজ ও শাসন করা তাহার ব্রত ছিল। প্রিয় ভৃত্য শঙ্কর নমশূদ্রও তদনুরূপ স্বভাবের লোক, কাজেই মনিবের হুকুমের অপেক্ষা না রাখিয়াই যে কোন কর্ম সম্পাদন করিত। হয়তঃ এক বিবাহের যোটক যাইতেছে, পথে আটকাইয়া চিনি- বাতাসা, পান-সুপারি, মাছ সব লুট করিল। হয়তঃ একজনকে বিনা অপরাধে রহস্যের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু অপামানিত করিয়া দিল।

সেই সময়ে খামারে অনেক জমি ছিল। হয়ত কোনও ভদ্রলোক পালকি চড়িয়া জমিনের উপর দিয়া যাইতেছে, ভৃত্য শঙ্কর মনিবের প্রতাপে তাহাকে তথা হইতে নামাইয়া হাল চষিতে আজ্ঞা দিল- না হয়তো দু'চারটি আইল ঘুরাইয়া দিল। হয়তো কোন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ খাইতে ছুটিয়াছে, জোর করিয়া কিছুকাল হালচাষ করাইয়া দিল। একদিন রতনপুরার কাজী বংশীয় এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত একান্ত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ভদ্রলোক পালকী চড়িয়া যাইতেছেন, অম্নি তাহাকে নামাইয়া হাল চষিতে হুকুম, তাহাতে অই ভদ্রলোক নিতান্ত অপদস্ত হইয়া ভোলানাথ দত্ত ও রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতিকে আনিতে আজ্ঞা করেন, যেহেতু তাহারা উক্ত কাজী সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ক্রমে গোলমাল হইতে হইতে খবর বাড়িতে পৌছিল, ভোলানাথ দত্ত ও রাজকৃষ্ণ দত্ত তাড়াতাড়ি কাজী

সাহেবের নিকটে গেলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন তোমাদের চাকর বলে আমাকে তোমাদের জমিন চাষ করিয়া দিবার জন্য, সেমতে আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছি। আইস আমি আগের লাঙ্গল ধরি তোমরা পরের লাঙ্গল ধর। তাহাতে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভোলানাথ দত্ত কাজী সাহেবকে যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয়ের সহিত সম্মানিত করিলেন। এই অবসরে শঙ্কর ছুটিয়া পালাইয়াছে। কতক্ষণ পর কাজী সাহেব বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হইলেন ও বলিয়া গেলেন- আমি গ্রামে পৌছিতে পৌছিতে তোমাদের বাড়ি দগ্ধ হইবে, শঙ্করের মহারোগ হইবে। বাস্তবিক তাই হইল, তিনি রওয়ানা হইবামাত্র অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া অতি প্রকান্ড প্রকান্ড বহু ঘর পরিপূর্ণ বাড়িখানা দগ্ধ হইল, পরে শঙ্করও মহারোগে পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

রাজকৃষ্ণ দত্তের স্ত্রী বড়ই সুশীলা ও ধর্মপরায়না ছিলেন। তিনি শিবপূজা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু দত্তজ তাহা মোটেই ভালোবাসিতেন না। কেবল দিনের মধ্যে বার বার খাওয়া এমন কি প্রায় এক কুড়ি কই মৎস ভাজা খাইতেন, কদলীর ছড়ি লটকান থাকিত, দুইটি তিনটি করিয়া মুখে দিতেন আর কাঠা দুই কাঠা খৈ দিয়া জল পান করিতেন। কোনও দিন তাহাতেও হইত না- হয়তঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে, এখনই পুনরায় পাক করিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই করিয়াছেন ও স্বামী সেবাতে যৎপরোনাস্তি দক্ষতা ও একাগ্রতা দেখাইয়াছে। তাঁহার এক কন্যা ছিল, শ্রীকাইল গৌরচন্দ্র দাস দারোগার নিকট বিবাহ দেন। বিবাহ সময়ে উক্ত গৌরচন্দ্র দাসের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। বাড়ি হইতে ছন মুলী দিয়া ঘর উঠাইয়া অনেক জিসিষপত্র দিয়া বিবাহ কর্ম সম্পাদন করেন। পরে দারোগা পদ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করেন ও অনেক ভূমি-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যান। এমতাবস্থায় কিছুকাল পরে রাজকৃষ্ণ দত্ত পাণ্ডুরোগে দেহত্যাগ করেন ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীকাইল মেয়ের বাড়িতে যাইয়া থাকেন। সেখানে কিছুকাল পরে জামাতা গৌরচন্দ্র দাসও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। পরে অনেক মহা সমারোহসম্পন্ন ক্রিয়া কর্মের পর রাজকৃষ্ণ দত্তের মেয়ে মারা যায় ও তাহার অনেক দিন পর স্ত্রী দেহত্যাগ করেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র দত্ত দারোগার পদ প্রাপ্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত কাজকর্ম ও বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়া যৎপরোনাস্তি সম্মান লাভ করেন। ইতিমধ্যে কোথাও পাহাড়ের মধ্যে এক সরদার ডাকাত অনেক ডাকাত সঙ্গে লইয়া গোপনে বসতি করিত ও কোথাও সুবিধা পাইলেই ভয়ঙ্করভাবে লুটতরাজ করিত। অনেক দিন যাবৎ এমত ঘটনা ঘটিতে থাকিলে অনেক প্রাচীন প্রাচীন পুলিশ কর্মচারীও কিছুতেই সেই সরদার ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। সে নানা রকমের বেশভুষা

করিয়া চলিত ও নানা স্থানে ফকিরের বেশে ঝুপ্‌রি বাঁধিয়া বসতি করিত। বিশেষ বিশেষ বহু তদন্তের দ্বারাও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় জিলার প্রধান কর্মচারী রামচন্দ্র দত্তকে ডাকিয়া উক্ত ডাকাত ধরিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি অতি উৎসাহের সহিত এবং নিশ্চয়ই ডাকাত ধরিয়া দিবেন বলিয়া উচ্চ কর্মচারীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্বীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে দুইজন মাত্র কনেষ্টবল বাছিয়া লইলেন। তাহার একজনকে দধির পসরা লইয়া গোয়ালা সাজিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে ও খোঁজ লইতে আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় কনেষ্টবল ভিক্ষুক সাজিল। তিনি নিজে নানা রকম ছদ্মবেশ লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রায় তিনমাস পরিভ্রমণের পর এক বৃদ্ধা মুসলমান মেয়ের নিকট অই ডাকাতের থাকিবার প্রকৃত বাসস্থানের খোঁজ পাইলেন এবং নিজে অতি কাঙ্গাল বেশে পাহাড়ের নিকটে নিকটে ঘুরিয়া এক উপত্যকায় অই ডাকাতকে ফকির বেশে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তখন ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি লোকজনসহ সেইখানে ডাকাতকে অতি বিচক্ষণতার সহিত হঠাৎ গ্রেপ্তার করেন। তাহাতে ঐ ডাকাতও নাকি রামচন্দ্র দত্ত দারোগাকে অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। ডাকাত অনেক প্রলোভন দেখাইল, তেজীয়ান দারোগা কিছুতেই বাধ্য না হইয়া তাহাকে বাঁধিবার জন্য পেয়াদাকে আদেশ দিলেন। পেয়াদা উদানের বাকল দিয়া হাত বাঁধিল। কিন্তু অম্‌নি খসিয়া পড়িল, কিছুতেই বাঁধ থাকিল না। এইরূপ যতবার দৃঢ়তার সহিত বন্ধন করে ততবারই বাঁধ খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে নবীন বয়স্ক দারোগা রামচন্দ্র দত্ত নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া ডাকাতকে অনেকগুলি বেত্রাঘাত করিল। তাহাতে ডাকাত অতি তীব্র নয়নে দারোগার দিকে চাহিয়া বলিল-যাও আমায় যেমন মারিলে তোমার দফাও শেষ করিয়া দিলাম। ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়া কোর্টে আসিল, তিন দিন পরই রক্ত বমি ও রক্ত বাহ্য হইয়া অকালে বালিকা স্ত্রীকে বিধবা করিয়া আত্মীয়স্বজনকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া দারোগা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী কুড়িঘর পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। আট দশ বৎসর হইল অতিশয় বৃদ্ধা হইয়া তিনি সেখানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রামহরি দত্তের ধারা একবারে এই রকম অবস্থায় নির্মূল হইয়াছে। মাত্র সুধারাম দত্তের পুত্র ভোলানাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ দত্তের পর্যায় বর্তমান আছে।

ভোলানাথ দত্তও সেই রাজেন্দ্র দত্ত, রাজকৃষ্ণ দত্ত, রামচন্দ্র দত্ত ইহাদের এক সময়েতেই খুল্লাতে দারোগার ভার প্রাপ্ত হয়েন ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

সেই সময়ে আমাদের দেশে নীলকর সাহেবদের বড়ই অত্যাচার এবং সে সময়ে ওয়াট্‌সন সাহেবের বড়ই প্রতিপত্তি, এখানে নীলের কুঠী, সেখানে নীলের কুঠী। চাষাদের আগুরী দাদনের টাকা দিয়া নীল চাষ করাইতেন ও অত্যাচারের এক সীমা

করিতেন এবং মুটে মজুর পথিক দেখিলেই বেগার ধরিয়া খাটাইয়া লইতেন। এমতাবস্থায় একদিন বারদীর নাগ পরিবারের তৎকালীন অভিভাবকের মাতা কোথায় যাইতেছেন এমন সময় তাহার সঙ্গীয় লোক নীল কুঠীর কর্মচারীর হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হয়েন, তাহাতে অই বৃদ্ধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বাড়িতে প্রত্যাগমন করেন ও সাহেবকে দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য ছেলেকে যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত করেন। তাহাতে নাগ বংশধর কলিকাতা যাইয়া তখনকার প্রধান কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন একটা সাহেব বধ করিতে হইলে কত টাকা দিলে অপরাধ মুক্ত হওয়া যায়, তাহাতে অই রাজকীয় কর্মচারী গল্পচ্ছলে বলেন এক লাখ টাকা দিতে পারলে হয়। এই কথাতে নাগ বংশধর তৎক্ষণাৎ দিতে স্বীকৃত হইয়া ওয়াট্‌সন সাহেবকে বধ করিবার প্রস্তাব করেন, তখন রাজ কর্মচারীর চৈতন্য হয়। তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনা জানিতে পাইয়া বলিলেন যদি তাহাকে স্থলে পাও তবে মারিতে পার, এই কথা বলিয়াই কৌশলে ওয়াট্‌সন সাহেবকে তাড়াতাড়ি জলপথে বিলাত যাত্রার জন্য সংবাদ দিলেন। সাহেব অগত্যার পর কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া জীবনের উপার্জন সকল ফেলিয়া নৌকা যোগে গোপনে কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় খুল্লার থানার নিকটে তিনি কি কার্যের জন্য স্থলে উঠিলেন তখন ভোলানাথ দারোগা সেখানে ছিলেন, তিনি উপরোক্ত সংবাদ পূর্বেই জানিতে পাইয়াছিলেন, এখন সাহেব স্থলে উঠিয়াছে শুনিয়া গোপনে একা যাইয়া সাহেবের হাতে ধরিলেন। ইহাতে সাহেব নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ইব্রাহিমপুরের খানেবাড়ি দারোগাকে দিবে বলেন ও জীবন ভিক্ষা চাহেন। ভোলানাথ দত্ত দয়াপরবশ হইয়া দাদা নাজির রাজেন্দ্র দত্তের নামে ঐ খানেবাড়ি লেখাইয়া লইয়া সাহেবকে ছাড়িয়া দেন ও সাহেব নির্বিঘ্নে বিলাত যাত্রা করেন- দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরে ভোলানাথ দত্ত নাছিরনগর থানায় বদলী হন। সেখানেও অতিশয় কৃতিত্বের সহিত অর্থ ও যশ লাভ করেন। তখন আমাদের দেশের গৃহস্থ মুসলমান কর্মীগণ নল কাটিবার জন্য নাছিরনগর থানার এলাকাতে যাইত। একবার অনেকজন মুসলমান কর্মী সেইখানে নল কাটিতে যায়। থানায় পুলিশকে জানাইয়া তখন নল কাটিতে হইত, কিন্তু তাহারা না জানাইয়াই বিস্তর নল সংগ্রহ করে। ইহাতে কনষ্টেবল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হুকুম জারি করে। তাহাতে তাহারা বলিল- তোমাদের দারোগাবাবুর মত দারোগা আমাদের অন্দরমহলেই অনেক আছে। তাহারা জানিত যে ভোলানাথ দত্ত সেখানে থানার দারোগা। এই সাহসেই রহস্য করিয়া এমত অভদ্রজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করে, কিন্তু কনষ্টেবল এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় জোর জব্বরের সহিত তাহাদিগকে থানাতে হাজির করে। তখন ভোলানাথ দত্ত তাহাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আদর আহ্লাদের

সহিত সম্মান রক্ষা করিয়া আহারাদি করাইয়া ছাড়িয়া দেন। তাহারা গ্রামে আসিয়া সর্বত্র এই কথা রাষ্ট্র করে, প্রশংসা করে।

ইতিমধ্যে রাজকৃষ্ণ দত্তকে চৈত্র সংক্রান্তির মিঠাই-এর যৎসামান্য মূল্যের জন্য দায়ী করাতে রাজেন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর ইব্রাহিমপুর খানেবাড়ি তথাকার স্থায়ী ভদ্রলোক পাল বংশীয়দের নিকট মাত্র দেড়শত টাকা মূল্যে বিক্রি করিয়া ফেলেন। সেই সময়ে ইব্রাহিমপুর পালেদের সঙ্গে কি রকম জানি সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের অনুরোধেই কথায় কথায় মূল্যবান সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যে বিক্রিত হইল। বর্তমান সময়ে ইহা যৎপরোনাস্তি আয়ের সম্পত্তি বটে। এখনও রাজেন্দ্র দত্তের নামেই খাজনা দাখিল হয় এবং লোকে রাজেন্দ্র দত্তের খানেবাড়ি বলিয়া থাকে।

ইহার কিছুকাল পরে ভোলানাথ দত্তও কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া কফ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়িতে আসেন। তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ উদয় দত্ত, মধ্যম ঈশান দত্ত, কনিষ্ঠ অক্রুর দত্ত। তদাবস্থায় ঢাকার গণি মিয়া সাহেবের পিতা আমাদের গ্রাম দর তালুক দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে ভোলানাথ দত্ত ও রাম কানাই পাল ঢাকায় যান, তখনও ছেলেদের কাহারও বিবাহ করান নাই। মাত্র আলাপাদি চলিয়াছিল এবং বিবাহের বহু ঘটাসমারোহ করিবেন বলিয়া লোক সমক্ষে বলিতেন।

ঢাকা যাওয়ার কিছুকাল পরেই একদিন বৈঠকখনায় বসিয়া আছেন হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ হয়। টাকা পয়সা কোথায় কি ছিল তাহা কেহই কিছুমাত্র জানিতে পাইল না। বিশেষতঃ সেই সময়ে চোর ডাকাতের ভয়ে অনেকেই ঘরের বাহিরে কোন নির্দিষ্ট স্থানে টাকা পয়সা গাড়িয়া রাখিতেন, সে কথা অন্য কাহাকেও জানিতে দিতেন না, এমন কি ভোলানাথ দত্তের উপার্জ্জিত ধনের কথা তাহার স্ত্রীও জানিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় হঠাৎ দূরদেশে মৃত্যু হওয়াতে একেবারে বাটীস্থ সকলেই হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ ইতিপূর্বে বাড়িতে যে সকল দাসদাসী ছিল তাহাদের একজনের বিবাহোপলক্ষে বাজি পোড়াইতে পুনরায় বাড়ি দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে ঘরদরজা শূন্য তাহাতে যিনি পরিবারের অবলম্বন হঠাৎ তাহার অভাব, একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইতে হইল। তাহার শ্রাদ্ধ কোনও রকমে যাঞ্চাবৃত্তি দ্বারা নির্বাহ হইল, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয় দত্ত সাবালক, ঈশান দত্ত স্কুলে পড়ে, অক্রুর দত্ত নাবালক অবস্থায় আছেন। বৈদ্যনাথ দত্ত ভোলানাথ দত্তের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেই পৃথক অন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়েও বৈদ্যনাথ দত্তকে সরিকানা বন্টনে কুঁড়েঘর ভিন্ন আর কোন জিনিষ পত্র কি টাকা পয়সা দেন নাই। এদিকে গ্রামে সকলেই দরতালুক আনিতেছেন, যদি কিছু অংশ না রাখা যায় তবে নানা রকম অশান্তি ও অসম্মানের কথা

হয়। কি করা যাইবে, অনেক ভাবনা চিন্তার পর জগমোহন সাহাকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ দত্ত ভোলানাথ দত্তের নামে গ্রামে দেড় আনা তালুক রাখেন এবং তাহাতে কতক টাকা ঋণ করিতে হয়।

উদয়চন্দ্র দত্ত পরে সরাইল চিতমা গুতমা গ্রামে বিবাহ করেন। সেখানে প্রবাদ এই রকম-অল্প কিছু টাকার জন্য মেয়ের পক্ষের লোক মেয়ে দিতে অস্বীকৃত হন, তাহাতে নিজ গ্রামের প্রসিদ্ধ বাদ্যকর সুবল মালী তাহার সঙ্গীয় লোকের সকলের হাতের সোনার বাজু খুলিয়া দেয়। এই ব্যক্তির এইরূপ সদাশয়তা দেখিয়া, পরে তথাকার লোকে মেয়ে ছাড়িয়া দেয় এবং বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি গ্রামস্থ জয়ার মাতা নাম্নী কোনও রজক কন্যাতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া তাহাকে বাড়িতে আনেন ও ভেক লওয়াইয়া বৈষ্ণবী করিয়া রাখেন। তাহার কিছুদিন পর বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হয় ও তিনি আর বিবাহ করেন নাই। কোথাও বিশেষ রকম কোন কাজকর্মও করেন নাই, একমাত্র ইন্দ্রিয় লালসা হইতেই পরে প্রমেহ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার অনেক বৎসর পরে বৈষ্ণবীর মৃত্যু হয়। তিনি বড়ই শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। একবার বাঘের মুখ হইতে বাছুর কাড়িয়া রাখিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

ঈশান দত্ত তৎকালীন বাংলা ও ইংরেজি লিখাপড়াতে নিতান্ত কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। লোকে বলিত তাহার দ্বারাই আবার দত্তবাড়ির অবস্থা পরিবর্তন হইবে। কিন্তু হঠাৎ কলেরা রোগে নবীনগরে তাহার অকাল মৃত্যু হয়। তাহার মা অর্থাৎ ভোলানাথ দত্তের স্ত্রী উন্মাদ হইয়া দেহত্যাগ করেন।

অক্রুরচন্দ্র দত্ত বহুকাল কাক্যাটেক নামক স্থানীয় নিতাই বাউল নামক জনৈক শক্তি সাধকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া পরে সংসার ত্যাগ করিবার মত প্রকাশ করেন। তাহাতে সেই ধারা নির্মূল হইবার উপক্রম দেখিয়া জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্তের মধ্যপুত্র বসন্তচন্দ্র দত্ত অনেক চেষ্টা যত্নের পর শ্রীকাইল বিবাহ করাইয়া দেন। পরে তাহার দিকে চারটি পুত্র সন্তান ও চারটি কন্যা জন্মে। নিতান্ত অবস্থার দায়ে পড়িয়া তৃতীয় সন্তানটি বিটঘর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার রমানাথ রায়ের স্ত্রীকে পোষ্যপুত্র প্রদান করেন ও বাড়ির নিজ অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধাংশ বৈদ্যনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা ইব্রাহিমপুর নিবাসী ঈশান চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট বিক্রি করেন। সেন মহাশয় কাশীতে দেহ ত্যাগ করেন। তাহার পুত্র রজনীকান্ত সেন ও মদনমোহন সেন বর্তমান সময়ে ঐ বাড়িতে স্বত্ববান হইয়া ভোগ দখল করিতেছে। পরে কফ্‌রোগে তিনি প্রায় অধিক বয়সে দেহত্যাগ করেন। বর্তমান সময়ে তাহার তিনটি পুত্র- জ্যেষ্ঠ দ্বারিকানাথ দত্ত, মধ্যম ব্রজনাথ দত্ত, কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র দত্ত বর্তমান থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

পিতামহ

পিতামহ বৈদ্যনাথ দত্ত নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় কবিরাজী ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং সর্বদা শিব পূজাদিকর্মে নিরত থাকিতেন ও নানা গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা করিয়া একজন শ্রোতা পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তবে নিতান্ত ক্রোধী ও তেজস্বী ছিলেন, তাহাতে সকলেই যৎপরোনাস্তি ভয় করিত। আমার পিতামহীও শিব পূজা ভিন্ন জল গ্রহণ করেন নাই এবং অবস্থার নিতান্ত শোচনীয়তার দরুণও স্বামী সেবাতে কখনও কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তৎকালে পতিপরায়ণতা সম্বন্ধে গ্রামে ও নিকটবর্তী স্থলে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল।

এক সময়ে আমাদের বাড়ির পশ্চিমের পুষ্করিনীর পারের বাঁশের ঝাড় সকল শ্রীকাইলের পূর্বোল্লিখিত গৌরচন্দ্র দারোগার স্ত্রী অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ দত্তের কন্যা কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া কতক টাকা ঋণ হইতে তিনি নিলাম করাইয়া দেন, গ্রামস্থ কালী কিশোর পাল নিলাম খরিদ করিয়া একেবারে সবগুলো বাঁশ নির্মূল করিয়া কাটিয়া লয়। পিতামহ বৈদ্যনাথ দত্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া তখন পালের পুত্রকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, এই বাঁশ দ্বারা তোর চিতা প্রজ্জ্বলিত হইবে, মৃত্যুকালে তুই বিষ্ঠা বমন করবি আর তোর স্ত্রীকে কৈবর্তে নিবে। কি আশ্চর্য ! বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল, বাঁশের ঝাড় নির্মূল করিবার অতি অল্প সময় পরেই কালীকিশোর পাল বিষ্ঠা বমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঐ বাঁশ দ্বারা তাহাকে দাহ করা হয় ও তাহার স্ত্রীকে কৈবর্তে লইয়া যায়।

পিতামহ বৈদ্যনাথ দত্ত অতিশয় শিবভক্তি পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও তিনটি কন্যা সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার পিতা পদ্মনাথ দত্ত, দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনাথ দত্ত, তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার দত্ত, চতুর্থ পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, প্রথম কন্যা ইচ্ছাময়ী, দ্বিতীয়া শৈশবেই মৃত্যুগ্রাসে পতিতা হয়, তৃতীয়া কন্যা হরমোহিনী। পিতামহ কেবল সামান্য কবিরাজী ব্যবসা দ্বারাই এই পরিবার প্রতিপালন করিতেন। তৎকালে রামহরি দত্তের প্রদত্ত যে সকল দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া শ্রীকাইল নিবাসী বরদেশ্বরীর পূজক আমাদের কুলপুরোহিত সকলের সাথে ভয়ানক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তাহাতে আমাদের সপক্ষে অনেত সাক্ষী ছিল ও অনেক নিষ্কর জমি পাওয়ার কথা ছিল। উদয়চন্দ্র দত্তকে নিয়া মুন্সেফ বাবু জিজ্ঞাসা করেন, উদয় বাবু আপনি ঐ সকল জমি চিনেন কিনা, তদুত্তরে তিনি বলেন- আমি ত মহাশয় চাষার ছেলে না যে জমি চিনিব, এই সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তাহাতে মুন্সেফ বাবু নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আমার পিতামহকে আহ্বান করিয়া অতিশয় আফসোসের সহিত বলিলেন, সেই সকল জমি মাত্র উদয় দত্তের সাক্ষ্যে ও প্রমাণাভাবে বিবাদীসকলকে ডিক্রি দেয়া হ'ল। ইহাতে

পিতামহ বড়ই মর্মাহত হইলেন এবং অতঃপর আর কোনও রকম অনুষ্ঠান না করিয়া পূর্বোক্ত তালুক খরিদের ঋণ বাবদ যাহা অস্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা বন্ধকাদি দিয়া কোনও মতে সুবিধা সুযোগ করিয়া থাকেন এবং আমার পিতা পদ্মনাথ দত্ত ও খুড়াদিগকে তৎকালের নিয়মানুসারে সাধারণ পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা দেন। পিতামহ অতিশয় বেশি বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন ছেলেকেই উপযুক্ত বয়স্ক বা উপার্জনক্ষম দেখিয়া যাইতে পারেন নাই এবং কাহারও বিবাহ দিয়া যান নাই।

এমতাবস্থায় ধীরে ধীরে কালস্রোতে মৃত্যুসময় নিকটবর্তী হইল। জ্যৈষ্ঠ মাস- বড় ঝড় তুফান হইয়া গিয়াছে। বাড়িতে পিতামহ দেবেরই রোপিত অনেক আম কাঁঠালের বাগিচা, ঐ দিনের তুফানের পর রাত্রিযোগে আম কুড়াইবার জন্য বাগিচায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন ও কিছু বৃষ্টিতে ভিজিলেন তাহাতেই পরের দিন সামান্য রকম জ্বর হয়। তখন তিনি জেঠা উদয়চন্দ্র দত্তকে ডাকিয়া বলেন- আমি আর থাকিব না আমার মৃত্যু নিকটবর্তী, তুমি অদ্যই পুষ্করিণী হইতে বড় কাতল মাছ উঠাইয়া তোমার খুড়িকে জন্মের মত ভোজন করাও। প্রথমে তিনি এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, পরে অতি গম্ভীর ভাবে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত ভাবেই মৎস ধরিতে হুকুম দিলেন। জেঠা উদয়চন্দ্র দত্ত মাছ ধরিয়া আনিলেন, বিশেষ আনন্দ ও সমারোহের সহিত ভোজন ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। পরদিন সকালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া, পিতৃদেব পদ্মনাথ দত্তকে বলিলেন- গ্রামে যাহাদের সঙ্গে নিতান্ত প্রণয় ছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। সেমতে তিনি সকলকে এই ঘটনা জানাইয়া আহবান করিয়া আনিলেন। গ্রামস্থ পুরোহিত কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য কবিরাজ উপস্থিত –– এমতাবস্থায় ছেলে-মেয়ে স্ত্রী সকলকে চারিদিকে বসাইয়া আত্মীয়গণকে বলিতে লাগিলেন, বন্ধুগণ! আমার শেষ সময় উপস্থিত, তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা করিবার জন্য ডাকিয়াছি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও। এই কথার পর পিণ্ড দেওয়ার চাউল কলা ইত্যাদি সংগ্রহ করাইলেন ও পুরোহিতকে একবারে চিতাপুরোক দিয়া বাড়ি যাইতে বলেন, বলিয়াই বিছানায় শুইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন- এই আমার হাটু পর্যন্ত অবশ হইল, এই কোমর পর্যন্ত, এই বক্ষ পর্যন্ত, এই কণ্ঠ পর্যন্ত, এই বলিয়া চকিত নয়নে সকলের দিকে তাকাইয়া সন্তানদিগকে কহিলেন- বৎস! আর তোমাদের চন্দ্র বদন দেখিতে পাইব না- বাহিরে নেও। এই কথার পরই দরজায় একটি মাটির কৃষ্ণ মূর্তি লটকান ছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন- দেখ্ সাবধান কুপথে কিন্তু নিসনা। আমি চলিয়াছি আমার সম্মুখে আয়, সঙ্গে আয়, এই বলিতে বলিতেই নেত্র নিমিলিত হইতে লাগিল, সকলে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন ও অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি নিজেও কখন কখন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন, তাহার একটি পদ তাহারই লিখিত অতি পুরাতন কবিরাজী ঔষধ লেখা পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে এবং অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক সংগ্রহ

পাওয়া গিয়াছে, সঙ্গীত এই-

কালী কালী বলে যে তার কিসে ভয়, দীন হীন প্রতি যদি তব দয়া হয়
তবে মা করিব পূঁজা মনে করি সার, দরিদ্র হইলে বৃথা জীবন তাহার
মানস করিয়া আছি মনে ভারি দুঃখ, কামনা করিলে পূর্ণ যাবে সব শোক
কালী কিছু চিন্তা না করি মা ভরসা তোমার
একা এক দুঃখিত আমি করিবা গো পার
বড় দুঃখ পাই আমি জান গো মা তুমি
আমাকে করগো কৃপা শুনগো ভবানী
তুমি বিনে আর কেহ নাহি গো আমার
দুঃখ না সহিতে পারি এ দুঃখ তোমায়
হিতরিত যে করে আমারে
এসব ত জানি না মাগো করিবা বিচার।

দীনহীন শ্রী বৈদ্যনাথ দত্ত দাসস্য

পিতৃদেব

পিতামহের মৃত্যু সময়ে পিতৃদেব পদ্মনাথ দত্তও এইমাত্র সাবালকত্বে পহুঁছিয়াছেন, অন্যান্য সকলেই অপরিণত বয়স্ক, এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া তিনিও যাহা পিতামহের নিকট দেখিয়া শুনিয়া ছিলেন সেমতে কিছু কিছু কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে যাহা যৎসামান্য আয় হইত তাহা দ্বারাই অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পিসীমা ইচ্ছাময়ীর বিবাহের উপযুক্ত বয়স, কাজেই ইব্রাহিমপুর নিবাসী ঈশানচন্দ্র সেনের নিকট কতক টাকা লইয়া পিসীমাকে বিবাহ দেন। ঈশান সেন তখন কলিকাতাতে তেজারতী কারবার করেন এবং পিতামহী তখনও বর্তমান আছেন। অবস্থার শোচনীয়তা দেখিয়া খুড়া শ্রীনাথ দত্তকে পিশামহাশয় কলিকাতা লইয়া যান। শ্রীনাথ দত্ত অতি বলিষ্ঠ তেজস্বী ও রূপবান পুরুষ ছিলেন। ভগবানের কি ইচ্ছা দৈব দুর্বিপাকে অল্প সময়ের মধ্যেই ওলাউঠা রোগে তিনি কলিকাতাতে দেহত্যাগ করেন। এই নিদারুণ সংবাদ বাড়িতে পঁহুছিল- পিতামহী উন্মাদ হইলেন।

এদিকে শিশু ভ্রাতা বসন্তকুমার দত্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শিশু ভগ্নী হরমোহিনী ও উন্মাদিনী মাকে নিয়া পিতৃদেব বড়ই সঙ্কটে পতিত হইলেন। যাহা উপার্জ্জন করিতে

হইত তাহাও নিজেই করিতেন। আবার বাড়িতে আসিয়া ঘর দরজা পরিষ্কার করা, পাক করা, সকলকে নানা রকম যত্ন করা প্রভৃতি কর্ম তিনিই করিতে থাকেন। নিজে চিড়া কুটিয়া ধান বানিয়া ইত্যাদি সকল কার্য করিয়া এদিকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া অতি যত্নে ও কষ্টের সহিত পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে পিতামহীর মৃত্যু হইল। তখন ছোট পিসী হরমোহনী কেবল শিশু। এমতাবস্থায় অতিশয় কষ্টের সহিত তাহাকে যৎপরোনাস্তি সতর্কতার সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। বসন্ত কুমার দত্তকে কাইতলা কৃষ্ণসুন্দর রায় জমিদারের সরকারে কাজকর্ম শিক্ষার জন্য দিয়া দিলেন। মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গ্রাম্য স্কুলে কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে পুর্বেকার ঋণে একবারে জড়িত অবস্থা। কি করিবেন, নানা উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে ইব্রাহিমপুর নিবাসী ঈশানচন্দ্র সেনের খুড়া নিতান্ত অসুবিধা দেখিয়া নবীনগর দুর্গাচরণ দে'র কন্যার সহিত পিতৃদেবের বিবাহ সাব্যস্ত করিলেন ও সেমতে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এমনই দুর্ঘটনা যে, বিবাহের রাত্রিতে মহেন্দ্রচন্দ্র দত্তের কলেরা হয়, তাহাতে বিবাহ জনিত আমোদ-আহলাদ জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃদেব ভাইয়ের জন্য কান্দিতে বসিলেন, তবে ভগবান যেন সে কান্না শুনিলেন। তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। বিবাহ নবীনগর হইয়াছিল। বিবাহের পর বাড়ি আসিলেন, তখন মাতা ঠাকুরানীও বালিকা, কোনও মতে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু পিতৃদেবের সৎস্বভাবে, উদারতায় ও অমায়িকতায় ক্রমেই সর্বসাধারণের মনে নিতান্ত প্রীতির উদ্রেক হইতে লাগিল এবং গ্রামে ও নিকটবর্তী নানাস্থানে ছোট বড় ভদ্র ব্রাহ্মণ সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতে ব্যবসার উন্নতিতে সংসারে কিছু স্বচ্ছলতা আসিল, ক্রমে ছোট পিসীমা বয়স্কা হইলেন। শ্রীহট্ট বেজোরা প্রধান চৌধুরী বংশে ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী নাজিরের নিকট বিবাহ দিয়া কতক টাকা পাইলেন, তাহাতে ঋণ এক রকম পরিশোধ হইল। এদিকে বসন্তকুমার দত্তও যৎসামান্য কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, এমতাবস্থায় একটু শান্তি আসিল। তখন নিতাই বাউলের শিষ্য গ্রামস্থ কানাই পাল আসন ঘর করিয়া সর্বদা মালসী গান ও উপাসনা করিতেন। তিনি তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং সদালাপ সৎসঙ্গ ও সদালোচনাতে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় সংসারের কর্ম নির্বাহ করিতেন, রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই কানাই পালের আসন ঘরে যাইয়া অতি ভক্তিভরে মালসী গাইতেন ও শুনিতেন, মা জগদম্বার প্রতি অসাধারণ অহেতুকী ভক্তি ছিল এবং নিতান্ত সরল বিশ্বাসী ছিলেন। যখন কোনও মালসী গাইতেন, তখন যেন প্রাণ ভরিয়া ভাবের আবেগ ছুটিত ও এত মিষ্ট বোধ হইত যে, তান লয় সংযুক্ত কণাবতের সঙ্গীতেও এত সুখ বোধ হইত না।

এমতাবস্থায় কিছুকাল পরে আমি গর্ভস্থ হইলাম, বাড়িতে সকলেরই মনে আশা ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, কারণ জেঠা উদয়চন্দ্র দত্তও নিঃসন্তান, স্ত্রী বিয়োগের পর আর বিবাহ করেন নাই। অক্রুরচন্দ্র দত্তও তখন অবিবাহিত, মাত্র এক দাসী তাহাদের ঘরের কার্য করিয়া থাকে ও বাহিরে উদয় দত্তের রক্ষিতা জয়ার মাতা বৈষ্ণবী বর্তমান, কাজেই বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান দেখিয়া সকলেই অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন ও উৎসাহিত হইলেন। আমি যখন ছয় মাসের গর্ভে তখন মাতা ঠাকুরানীর এক বিধবা মাসী এই পরিবারে আসেন ও ক্রমে তিনিই স্নেহের বশবর্তী হইয়া বহুকাল পর্যন্ত আমাদের চারি ভাই ও দুই ভগ্নীকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়া দেহত্যাগ করেন।

জীবন প্রভাত

কালসিন্ধু নীরে যবনিকা পারে
কোথায় আছিনু লুকি
মহাকাল সনে বসি একাসনে
কতকাল মাখামাখি
কালে কাল গেল সময় হইল
ইচ্ছাময় ইচ্ছা মতে
মানব রূপেতে এই অবনীতে
প্রকাশিত অচম্বিতে
জয় হুলুধ্বনী জনক জননী
প্রতিবেশী সহচরা
সকলে মিলিয়ে মম পানে চেয়ে
আহ্লাদে আপনা হারা
তর্ তর্ করি অমিয়া মাধুরী
ছুটিল জীবন স্রোতে
স্নিগ্ধ সমীরণ চাঁদের কিরণ
সৌগন্ধ মাখিয়া তাতে
চকমিত চিতে হেলিতে দোলিতে
ফেলিল আমোদে মাতি

নাহি ভেদজ্ঞান সকল সমান
কিবা দিবা কিবা রাতি
তারকার সনে আকাশের পানে
বায়ুর তরঙ্গে ভাসি
শুদ্ধ নিরমল অতীব উজ্জ্বল
বদনে মাখিয়া হাসি
সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন
চির প্রিয় সখা সনে
আনমনে কথা কতই বারতা
কহিলাম হাসি মনে
গেল কত দিন শৈশব বিলীন
বিষম কালের স্রোতে
ছুটিল জীবন কে করে বারণ
কৈশোর আইল তাতে

বাঙ্গলা ১২৮৪ সনের ১০ই মাঘ, পূর্বের দিন রাত্রিতে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের পাণ্ডা দুইজন অতিথি উপস্থিত। অতিথি সেবার আয়োজন হইতেছে এমতসময়ে মাতাঠাকুরাণী প্রসব বেদনায় কাতর হইলেন। মায়ের মাসী আমার দিদিঠাকুরাণী টের পাইয়া মাকে সান্ত্বনা করিয়া বসাইয়া রাখিলেন ও নিজে সকল কর্ম করিতে লাগিলেন।এমতাবস্থায় এক দুর্বিপাক উপস্থিত হইল বাড়ির নিকটবর্তী খালের পূর্ব পাড়ে। বাড়িতে বিশেষ কোনও ভাল ঘরদরজা না থাকায় সাহা বাড়ির একখানা ঘর চল্লিশ টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়, ঘরের টাকা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া আনা হয় নাই- এমতাবস্থায় ঐ রাত্রিতে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ঘরখানা ভস্মীভূত হইল। মাত্র একজোড়া কবাট সম্মুখের ঝাপ ও কয়েকটা কাঠের পাল্লা অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে সকলেই ক্ষুন্নমনা হইয়া বাড়িতে বসিয়া আছেন, রাত্রি প্রভাত হইল- মাতা ঠাকুরাণীও বেদনায় অস্থির হইলেন, বেলা প্রায় দুই প্রহর হয় হয় সময়ে আমি ভুমিষ্ট হইলাম। তাহাতে আমাকে দেখিয়া বাড়িস্থ সকলেই দৈব দুর্বিপাক জনিত কষ্ট ভুলিয়া গেলেন ও অতি আনন্দের সহিত পুষ্করিণী হইতে মৎস ধরাইয়া জেঠা উদয়চন্দ্র দত্ত সর্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন। শ্রীকাইল হইতে আমার পিসীমা গৌরচন্দ্র দারোগার স্ত্রী সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সোয়ারী করিয়া দেখিতে আসিলেন। বাড়ি লোকে লোকারণ্য, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। তখনও জগন্নাথের পাণ্ডাদ্বয় বাড়িতেই আছেন, তাঁহারা আমাকে দেখিয়া শ্রী জগৎবন্ধু দত্ত নামে অভিহিত করিলেন ও অনেক আশীর্বাদ করিয়া বিকালে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পিতৃদেবের কবিরাজী ব্যবসা দ্বারা সংসারের ব্যয় সাধারণ মত একরকম ভালই চলিতে লাগিল। বসন্ত দত্ত কাইতলা জমিদার সরকারেই কাজ করিতেছেন, ছোট ক্ষুড়া মহেন্দ্র দত্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া কাজকর্মের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। মাতা-ঠাকুরাণী পুনরায় অন্তঃস্বত্বা হইলেন, একটি পুত্র প্রসব করিলেন, আতুড় ঘরেই সেইটি নষ্ট হইল। ইহার পর প্রায় তিন চার বৎসর অতিবাহিত হইল, আর কোনও সন্তান সম্ভাবনা দেখা গেল না। এমতাবস্থায় জোয়ানসাই অষ্টগ্রাম নিবাসী কালু ফকির নামীয় জনৈক মুসলমানের কোনও ক্রিয়াতে মা পুনরায় অন্তঃস্বত্বা হইলেন এবং আট মাস গর্ভের সময় সাংঘাতিক জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন খাল্লার বাজারে লোচন পোদ্দার নামে বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক পশারী দৈবানুগ্রহে নানাবিধ অলৌকিকভাবে লোকের উপকার ও ভুত ভবিষ্যৎ বলিয়া বড়ই প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। পিতৃদেব আশু সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু তিনি জীবনাশা নাই বলিয়া নিরাশ করিয়া দিলেন। তখন বর্ষাকাল, নৌকাযোগে গ্রামস্থ মাধবচন্দ্র পাল ও তিনি একযোগে গিয়াছিলেন। রাস্তায় আসিয়া পিতৃদেব কান্দিতে লাগিলেন, তখন মহা-মনস্বী বুদ্ধিমান মাধবচন্দ্র পাল বলিলেন- তুমি কিছুতেই নিরাশ হইও না, ফকিরেরও ভুল আছে। বাড়িতে যাইয়া সত্বর গর্ভ চিন্তামনি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইতে থাক নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। এই উপদেশানুসারে বাড়িতে আসিয়াই উপরোক্ত ঔষধের বটি তৈয়ার করিয়া সেবন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে অল্প সময়ের মাধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। সেই আমার প্রথম ভগ্নী- নাম হেমন্ত কুমারী। মেয়ে পাইয়া পিতামাতার মনে যথেষ্ট আনন্দ হইল, কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা পিতৃদেবের অতিশয় যত্নে লালিত অতি আদরের প্রাণসমা ছোট ভগ্নী হরমোহিনী এই সময়ে সাংঘাতিক গ্রহণী রোগে পীড়িতা হইয়া এখানে আসিল ও অনেক চিকিৎসাতেও আরোগ্য না হইয়া একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করিল। পিতৃদেব নিতান্ত কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন কাজেই এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া দুঃসাধ্য পিওশূল ব্যধিতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

ঔষধাদি ব্যবহারেও বিশেষ কোন ফল প্রসব করিল না। সেই সময়ে কাক্যাটেকের নিতাই বাউলের বড়ই প্রতিভা, তিনি আমাদের গ্রামে আসিতেন এবং আমাদের বাড়িতেও আসিতেন। এমতাবস্থায় রোগমুক্তির জন্য তাহার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল দর্শিল না দেখিয়া এক রকম জীবনে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

আচার্য্য আনন্দস্বামীর সন্ধান লাভ

এই সময়ে বসন্তচন্দ্র দত্ত কাইতলা কৃষ্ণসুন্দর রায় জমিদার সরকারে চাকরি করেন। কৃষ্ণসুন্দর দুই বিবাহ করেন ও পূর্বের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি শিবামুণ্ড রোগে অচল হয়েন এবং কোথাও কোন চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া নিরাশ হয়েন, তখন পরম্পরা শুনিতে পান- আচার্য্য আনন্দ স্বামী সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া আপামর সাধারণ লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলিতেছেন ও দৈব বলে রোগাদি আরোগ্য করিতেছেন। ইহাতেই কর্মচারী বসন্তচন্দ্র দত্ত ও গোমস্তা ফজর আলীকে সেখানে পাঠাইবার মনন করিয়া প্রস্তাব করেন। বসন্ত দত্ত মহশয়েরও পূর্ব হইতেই সাধু ফকিরের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল এবং নিজে কখন কখন এই রকম লোকের সঙ্গ লালসায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও বিবেকীর মত চলিতেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া নিতান্ত আনন্দের সহিত কালীকচ্ছ রওয়ানা হইলেন। বিকাল বেলায় আশ্রমে উপস্থিত হওয়াতে, স্বামী মহাশয় বলিলেন- আগামীকল্য প্রাতে দেখা করিবেন, তাহাতে তাহারা সে রাত্র অতিথি থাকিয়া পরের দিন সকালে মহাপুরুষ সমীপে উপনীত হইলেন। দেখিলেন আরো অনেক লোক যার যার নানা বিষয় নিয়া সেখানে উপস্থিত আছে, তাহাদের মধ্যে তাহারাও দুইজন। এমতাবস্থায় তিনি বাড়ির মধ্যে হইতে নিতান্ত ভাব- বিভোর অবস্থায় আসিয়া নিজ আসনে দালানের দক্ষিণের কোঠায় উপবেশন করিলেন এবং একটু ধ্যানস্থ হইয়াই বলিলেন- যে ব্যক্তি অগ্রে আসিয়াছ সে আইস। তাহাতে বসন্ত দত্ত ও ফজর আলী আগের দিনই উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তাহারা দুইজনই প্রথমে সম্মুখে আসিলেন, আসিবামাত্রই ধ্যানস্থ হইয়া পরে বলিলেন- আপনার বাড়ি কোথায় ? খুড়া মহাশয় বলিলেন সাতমোড়া, কাইতলা কৃষ্ণ সুন্দর রায়ের রোগের জন্য আসিয়াছি। তাহাতে তিনি বলিলেন- উক্ত রায় ভাল হইবে না, সে দুই বিবাহ করিয়া এক স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফজর আলীর দিকে সন্তান জন্মিত না, তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন- তোমার সন্তান নাই এই জন্য লোকে তোমাকে আপুত্রা, আটখুড়া বলে এবং ইহাতে নিতান্ত মনঃ দুঃখিত আছ। তবে এই নাম জপ করিলে এত দিনের মধ্যে একটা মেয়ে জন্মিবে ইত্যাদি। বাস্তবিক এই সময়ের মধ্যে তাহার মেয়ে জন্মিয়াছিল। এই সকল কথোপকথনের পর বসন্ত দত্ত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেকানেক কথা বলিয়া হঠাৎ ধ্যানস্থ হইলেন এবং বড়ই ঔৎসুক্যের সহিত বলিতে লাগিলেন-

১. আপনাদের বাড়ির দক্ষিণে একটি পুষ্করিনী আছে তাহার দক্ষিণে আরও একটি ছোট পুষ্করিণী, ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের দক্ষিণ ভাগে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ ও জঙ্গল। এই জঙ্গলের মধ্যে অনেক দিন যাবত এক সাধক বসিয়া আছে, আপনি জানেন ?

বসন্ত দত্ত- হ্যাঁ, আছে জানি- সে অনেক দিন যাবত সেখানে তপস্যা করিতেছে, বাড়ি আমাদের গ্রামেই, জাতিতে কর্মকার।

স্বামীজী- হ্যাঁ হ্যাঁ তাহার কথাই বলিতেছি, তাহাকে যাইয়া বলিবেন শীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা করে নতুবা তাহার নিতান্ত প্রত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। বাস্তবিক তখন গোপাল দাস, পিতা পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কলেরাতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বিবেকী হইয়া এই বৃক্ষতলে বসা ছিল এবং তাহার সহিত বসন্ত দত্ত মহাশয়ের বিশেষ প্রেম-প্রীতি ছিল। তিনি উপরোক্ত কথা শুনিয়া তথা হইতে বিদায় হইয়া কাইতলা সংবাদ পৌছাইয়া বাড়িতে আসিলেন এবং সাধারণ সমক্ষেও গোপাল সাধুকে ঐ সকল কথা শুনাইলেন। গোপাল সাধু তখন এক রকম জাতি ত্যাগ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিতান্ত অনুরাগের সহিত গাছতলায় উপবিষ্ট আছেন। এমতাবস্থায় স্বামী মহাশয়ের বাণী শ্রবণ করিয়া সত্বরই অতি উৎসুক্যের সহিত কালিকচ্ছ রওয়ানা হইয়া স্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইল ও কিছুদিন সঙ্গ করিয়া স্বামী মহাশয়কে সাতমোড়াতে আনিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

তখন গোপাল সাধু প্রমুখাৎ তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত হইল, ক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে মহাপুরুষ অত্র সাতমোড়াতে শুভাগমন করিল। মহাসমারোহ-লোকে লোকারণ্য, দিবা-রাত্রি ভেদ নাই এত ঘটা আরম্ভ হইল। দুঃখী, তাপী, ধর্ম্মপিপাসু, তার্কিক, সাধু, ফকির, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, রোগী-শোকি, দর্শক সাধারণ, ভদ্র ব্রাহ্মণ বহুলোকের সমাগমে সাতমোড়া আনন্দের আগমনে আনন্দ হিল্লোলে হেলিতে দোলিতে লাগিল। কুলের কুল বধু পর্যন্ত মহাপুরুষের দর্শন লালসায় নিতান্ত অধীর হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় আসিবার পর দিনে দুই প্রহরে উপাসনা করিতে বসিবেন, এমন সময় কলিকাতা হইতে এক চিঠি আসিয়া পৌছিল, তাহাতে লিখা- "বাণী সত্য হইয়াছে, বিবাহ সময়ে অমুক বাবু হঠাৎ মারা পড়িয়াছেন।"

অর্থাৎ তিনি কলিকাতায় কোন বাবুর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন- শীঘ্রই বিবাহ হইবে, কিন্তু বিবাহকালীন হঠাৎ একটি লোকের এই বিবাহ সভাতেই প্রাণ বিয়োগ হইবে।

উপরোক্ত চিঠি পাইয়া তিনি হাসিলেন। তাহাতে সকলেই বিবরণ জানিতে উৎসুক্য হইল। তখন তিনি সাধারণ সমীপে এই কথা প্রকাশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া উপাসনা কার্য্য শেষ করিলেন।

এই সময়ে গ্রামে নিতাই বাউলের শিষ্য কানাই পালের আসন ঘরে সকলেরই যাতায়াত ছিল এবং কানাই পালও গুরোপদ্দিষ্ট মতে সাধন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু

তৎপুত্র ধরণীধর পালের তাহা সহ্য হইত না, তাহাতে তিনি মাঝে মাঝে বড় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পিতার মনে বড়ই কষ্টের কারণ হইত।

তখন ধরনী বাবু ইংরেজি স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া পঞ্চম কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। কিন্তু পড়িতে বসিলে চক্ষুতে অন্ধকার দর্শন হয় পুস্তকের লিখা দেখিতে পান না, তাহাতে স্বামীজীর নিকট কষ্টের কথা নিবেদন করেন। তখন স্বামীজী বলেন- তোমার পিতা একজন সাধক, একখানা আসন ঘর করিয়া তিনি সাধনে নিযুক্ত আছেন, তুমি তাহাতে বড়ই বিরক্ত করিতেছ এবং পিতার মনে কষ্ট দিতেছ, এই কারণে তোমার এমত হইয়াছে। অতএব পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিলেই শান্তি আসিবে। এই বাক্যে সেদিনই তিনি পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও চরণামৃত গ্রহণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করিয়া স্বামীজীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণে অতি সমারোহের সহিত নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া নেন।

কিন্তু কানাই পাল তাহাতে আনন্দিত না হইয়া বিমর্ষ হইল ও আরবী এবং হিন্দিতে তর্ক করিতে প্রস্তুত হইয়া নিতান্ত ক্রোধের সহিত বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহাতে স্বামীজী অতি ধীরতার সহিত একটি মাত্র আরবী বচনে কানাই পালকে একেবারে নিরস্ত করিয়া রাখিলে আর বাক্যস্ফুর্তি হইল না।

তৎপর তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আবার দক্ষিণ পাড়া ফিরিলেন, তখন আমাদের বাড়িতে আসেন ও আমাকে কোলে লইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়েন,- এই সময়ে পিতৃদেব পিওশূল রোগে শয্যাগত, স্বামীজীর শরণাপন্ন হয়েন ও নাম গ্রহণ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে পুনরুজ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর স্বামীজী চলিয়া গেলেন, অনেকেই কৃপা লাভে কৃতার্থ হইল। তাহাদের মধ্যে আমাদের পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ের শিবনাথ নমশূদ্র ও গ্রামস্থ আনন্দ পালের বিষয় উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ নিতান্ত দরিদ্র ছিল, একবেলা আহার জুটিলে হয়ত অন্য বেলা আর জুটিত না। এমতাবস্থায় স্বামীজীর চরণ প্রান্তে শরণ লইয়া অসাধারণ কৃপালাভে অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ আত্মোন্নতি লাভ করিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিল এবং তত্ত্বজ্ঞানস্ফুরিত বাণী-যোগ লাভ করিতে পারিয়া সাধারণের মধ্যে দয়াময় নাম প্রচার ও অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় বেশ আনন্দের সহিত দিন কাটিতেছে, কোনও জিনিসের অভাব নাই। পূর্ব কথিত বটতলার দক্ষিণে ঘর উঠাইয়া মহা প্রতিপত্তিতে সময় কর্তন করিতে লাগিল। প্রায় অনেকদিন গত হইয়াছে, মাঝে মাঝে স্বামীজী প্রায়ই সাতমোড়া আসেন। এবারও আসিয়াছেন, কিন্তু শিবনাথের আর পূর্ব্বের মত ভক্তি নাই, যেমন কেমনতর ভাব বুঝা যাইতে লাগিল। মানুষের প্রদত্ত গরুতে ঘরে এক গোহাল হইয়াছে। সকল বাড়িতে গোবরে ভরা, স্বামীজীকে বড় আদর অভ্যর্থনা করিলেন না, তাহাতে তিনি মনে বিরক্ত হইলেন কিনা বুঝিতে পারি নাই।

সেদিন বিকালে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কারণবশতঃ যাওয়া হইল না। কাজেই রাত্রিতে গোপাল সাধুর ঘরে অবস্থিতি করিলেন। যাওয়ার কথা ছিল বলিয়া দুধ রাখা হয় নাই। তখন শিবনাথের ঘরে গাভী আছে, প্রাতে বিকালে বেশ দুধ পাইয়া থাকে, এমতাবস্থায় স্বামীজী নিজ প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র শীলকে দুধের জন্য শিবনাথের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেন ও বলেন- এই বেলার দুগ্ধ আমাকে দিতে বলিয়া আইস। কৃষ্ণচন্দ্র শীল দুগ্ধ চাহিলে শিবনাথের স্ত্রী বলিয়া উঠিল- না, বল যেয়ে দুধ দিতে পারিব না। আমার নাতির জন্য দুধ পাতিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শুনিয়া আবার কৃষ্ণ শীলকে পাঠাইয়া অনেক কথায় দুগ্ধ আনিলেন ও গোপাল সাধুর সঙ্গিনী ইচ্ছাময়ীকে দুগ্ধ জাল দিতে বলিলেন। ইচ্ছাময়ী স্বভাবতঃ অতি অল্প ক্রোধী মেয়ে। সে নিতান্ত বিরক্তির সহিত সামান্য দুধ জালে বসাইল, তাহাতে দুধ নষ্ট হইয়া গেল। ইহার পর স্বামীজী রাত্রিতে আহার করিতে বসিলে পর ঐ দুগ্ধবাটি সহকারে স্বামীজীর সম্মুখে ধরিলে তিনি সামান্য মাত্র অল্প আহার করিয়া দুগ্ধের বাটিতে হাত দিয়া দুধ উঠাইয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে মাটিতে কয়েক ফোটা ফেলিয়া অমনি আচমন করিতে উঠিলেন ও পরের দিন আশ্রম অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ইহার পর হইতেই এককালীন শিবনাথের প্রতিভা কমিয়া গেল, লোকে আর ভালবাসে না- হৃদয়ে আনন্দ নাই। সারাদিন গরু বাছুর লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিল। ইহার অল্প পূর্ব সময়ে একটি পাঁচ ছয় মাল্লা পাটলাই নৌকা খরিদ করিয়া পাতিল বেচা কীনা করিবার ব্যবসা খুলিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর ক্ষতি হইল। ক্রমে ক্রমে চার পাঁচ বৎসর পর জ্বর ও মাথাধরা হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল, স্বামীজী চিঠি দিলেন- আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই সকল কষ্ট দূর হইবে বিশেষতঃ গাছতলায় থাকিলে তাহার জীবন বিয়োগ হইবে না। এই চিঠি পাইয়া শিবনাথ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া মুরাদনগর জামাতার বাড়িতে চলিয়া যায়। যেদিন রাত্রিতে সেখানে গিয়াছিল সেই রাত্রিতেই তাহার দেহত্যাগ হইয়া স্বামীজীর বাক্যের অব্যর্থতা রক্ষা করিল। তাহার স্ত্রী সর্বস্বান্ত হইয়া প্রায় অনেকদিন পর কলেরা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিল।

দ্বিতীয়-আনন্দ পাল গ্রামস্থ পাল বংশদের অতি সাধু স্বভাবাপন্ন এবং শিষ্টাচারী লোক ছিলেন। তিনি অতি ভক্তিভাবে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অনেক সঙ্গীতাদি রচনা করেন। পরে কোনও দৈব- দুর্বিপাকে দেশত্যাগী হইয়া জীবনের শেষকাল ঢাকাতে অতিবাহিত করেন ও পরে তথায়ই দেহত্যাগ করেন।

ইহা ভিন্ন আরও অনেকানেক লোক স্বামীজীর নিকট হইতে নানা রকমে শান্তিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। যখন তিনি প্রথমবার সাতমোড়া আসেন তখন আমার অতি শৈশব

কাল। সে সকল ঘটনা ঈষৎ মনে জাগিতেছে মাত্র। এদিকে বসন্তকুমার দত্ত উপযুক্ত বয়স্ক, কাজেই অষ্টগ্রাম ঈশান ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ হইল। মেয়ে কালবর্ণা ছিল বলিয়া বিবাহের ঘটক পিসা ঈশানচন্দ্র সেনকে, পিতৃদেবকে তিনি যৎপরোনাস্তি অবমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। কিন্তু সদাশয় পিতৃদেব অতি নীরবে সেই সকল যন্ত্রণা সহ্য করেন। ইহার মধ্যেই ছোটখুড়া মহেন্দ্র দত্ত, বসন্ত দত্তের শ্যালকের সঙ্গে কাছাড় চলিয়া যান ও চা বাগানে চাকুরি নেন। কিছুকাল পরেই বসন্ত দত্তের ঐ স্ত্রী আতুড় ঘরে একটি ছেলে গর্ভস্রাব হইয়া নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অনেক দিন বিবেকীর মত হইয়া পরে কাছাড় চলিয়া যান। মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কাছাড় হইতে ১০০ টাকা বাড়িতে দেন, তাহা দ্বারা আবার বসন্ত দত্তকে জয়নগর রাজচন্দ্র সরকারের কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় পরিণয় করান হইল। ইহার পর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি কোথাও কোন কাজে যান নাই, কেবল বাড়িতেই বসিয়া থাকেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় বদরাগী ও কোপন স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি, কাজেই শৈশবের কথা ভুলিয়া যাইয়া প্রতি মুহূর্তে পিতৃদেবকে নিরতিশয় জ্বালাতন করিলেও তিনি কিছুই বলেন নাই। এমতাবস্থায় মহেন্দ্র দত্তের কাছাড়ের চাকরি গেল, বাড়ি আসিলেন- মাধবপুর উদয় সেন উকিলের কনিষ্ঠ ভগ্নীর সহিত বিবাহ কর্ম সম্পাদন হইল। তিনিও আর বাড়ি হইতে কোথাও গেলেন না, ক্রমে পিতৃদেবের কবিরাজী ব্যবসাতে সাহায্য করিতে যাইয়া কবিরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন। এখনও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন।

বসন্ত দত্ত দ্বিতীয় পরিণয়ের পর বহুকাল বাড়িতে থাকিয়া মহেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া আরাকান চলিয়া যান। কিছু কাল পরে মহেন্দ্রচন্দ্র দত্তও শৈশবের কথা ভুলিয়া গিয়া পিতৃদেবের সঙ্গে পৃথকান্ন হয়েন। বৎসরকাল সময় পরে কি জানি কি মনে ভাবিয়া আবার একান্নভুক্ত হইয়া পড়েন। বসন্ত দত্ত অনেক ঘুরিয়া চট্টগ্রাম জয়নগর নিবাসী রামকুমার দে'র গদীতে চাকরি নেন, এবং তিন চারি বৎসর আর বাড়িতে আসেন নাই। পরে আসাম-বেঙ্গল রেল হইলে পর ১৩০৩ সনে আমি যাইয়া চট্টগ্রাম হইতে বাড়িতে আনয়ন করি। ইহার পর ঐ স্থানেই অদ্য পর্যন্ত কর্ম করিতেছেন। কিন্তু ১৩১৪ সনের ফাল্গুন মাসে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় সাংঘাতিক রোগে পা দু'খানা পচিয়া গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি গৃহশূন্য- চট্টগ্রাম পূর্বোক্ত কাজে আছেন।

মহেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি মেয়ে জন্মে, বড় ছেলেটি কিছু দিন পূর্বে জ্বর প্লীহা রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে ১৩০৬ সনের চৈত্র মাসে হঠাৎ কলেরা রোগে তাহার স্ত্রী পুত্র দুই-ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে তিনি কুড়িগর যজ্ঞেশ্বর ধর মহাশয়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র

মেয়ে জন্মিয়াছে, আর জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। মেয়েটিকে বাঞ্ছারামপুর রজনীকান্ত দাসের নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। মেয়ের দিকে একটি নাতনীও জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিনিই এখন সকল পরিবারের ভার নিয়া আছেন কিন্তু নিতান্ত হঠাৎ ক্রোধী লোক হওয়ায় প্রায়ই অশান্তি উৎপাদন করেন ইত্যাদি।

আমারা ক্রমে ছয়টি ভাই, চারটি ভগ্নী জন্ম গ্রহণ করি। আমার কনিষ্ঠ একটি ভাই আতুড়ে ঘরে মারা গিয়াছে তাহা পূর্বেই লিখা হইয়াছে, ইহার পর এখন পাঁচ ভাই বর্তমান আছি। আমার নাম মনোমোহন দত্ত, দ্বিতীয় শ্রী ক্ষেত্রমোহন দত্ত, তৃতীয় শ্রী নরেন্দ্রমোহন দত্ত, চতুর্থ শ্রী দেবেন্দ্রমোহন দত্ত, পঞ্চম শ্রী ফণীন্দ্রমোহন দত্ত। প্রথমা ভগ্নী হেমন্ত, দ্বিতীয়া নির্মলা, তৃতীয়া বুড়ি, চতুর্থা প্রিয়বালা। পিতার বর্তমান অবস্থায়ই প্রথমা ভগ্নী হেমন্তকে গঙ্গামণ্ডল বিষ্ণুপুর কৃষ্ণকুমার দে'র নিকট বিবাহ দেন, দ্বিতীয়াকে রছুল্লাবাদ গিরিশচন্দ্র দে'র নিকট বিবাহ দেন। তৃতীয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চতুর্থা প্রিয়বালা পিতার মৃত্যু সময়ে মাতাঠাকুরাণীর গর্ভস্থ ছিল, পরে প্রসব হইয়াছে।

পিতৃদেব শৈশব হইতে এই সকল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, নিতান্ত কোপন স্বভাব ভ্রাতাদিগের প্রাত্যাহিক নানাবিধ কটু কাটব্য শ্রবণ করিয়াও একান্নভুক্ত পরিবার রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমাকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করাইয়া মোক্তারী পড়িতে দেন, কিন্তু বিবেকের তীব্র তাড়নায় পাঠে মনোনিবেশ না হওয়ায় আমি মোক্তারী পাশ করিতে পারি নাই। কাজেই তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, সর্বদাই আমার উপার্জন ক্ষমতা দেখিলেন না বলিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে ক্ষেত্রমোহনকে কবিরাজী পড়িতে দিয়াছেন। ক্রমে আমার সংসার বিরাগ দেখিয়া বিবাহ করাইলেন। ইতিমধ্যেই তৃতীয়া ভগ্নী বুড়ি হঠাৎ শোথরোগে চার বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে। তিনি কিছুতেই এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া হৃদরোগগ্রস্থ হন এবং এই অবস্থায় অন্তত আড়াই বৎসরকাল কখন সুস্থ কখন অসুস্থ অবস্থা ভোগ করিয়া ১৩০৯ সনে মহালয়া অমাবস্যার সাত দিন পূর্বে সন্ধ্যার সময় আমাকে কাছে ডাকিয়া বলেন যে, বাবা তুমি তো নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ধ্যান করিতে শিখিয়াছ ও কোন কোন বিষয় বুঝিতে পার, দেখতো আমি আর কতকাল বাঁচিব !

এই কথার পর মন কিছু চঞ্চল হইল- ধ্যানস্থ হইলাম, তাহাতে প্রথমে দেখিতে পাইলাম- একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল তোমার পিতা আরও চৌদ্দ বৎসর বাঁচিবে, অমনি আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল- না এই কথা ঠিক নয়, আর মাত্র সাত দিন জীবন আছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলে ? বলিলাম আরও চৌদ্দ বৎসর বাঁচিবেন। তিনি বলিলেন- না, আর কোনও কথা আছে কিনা ! আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম, হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলাম, কিছু

না বলিয়া অন্য আলোচনা করিতে লাগিলাম ও সেই দিন হইতে ভাগবত শুনাইতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে সাত দিন পূর্ণ হইতে চলিল, আমার প্রাণে কেবল দিন নাই রাত নাই আইচাই করিতেছে, চক্ষু মুদিলে যেন আমার গলায় ধরা দেখিতে পাই।

আবার মনের কল্পনা বলিয়া দূরে সরাইয়া দেই, কিন্তু এ ধান্দা যে সত্যরূপী ক্রমেই গাঢ় হতে গাঢ়তর ভাবে আতঙ্ক আমাকে জড়াইয়া ধরিল। একদিন রাত্রে স্বপ্নেও দেখিলাম নাপিত আমার মাথা ক্ষুর দিয়া চাচিয়া ফেলিতেছে, আরও চমকিত হইলাম, কিছুতেই শান্তি নাই, ক্রমে অমাবস্যা উপস্থিত। শারদীয় আকাশে আনন্দের চিহ্ন দেখা দিতেছে- অনন্ত প্রকৃতি আনন্দে আত্মহারা, ঘরে ঘরে বাড়িতে বাড়িতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জগদম্বার আগমনী বারতাতে নুতন উচ্ছ্বাসে শোকতাপ ভুলিয়া গিয়া যার যার অবস্থানুযায়ী ভাবে সজ্জিত হইতেছে। সকলেরই মুখে হাসি, প্রাণে আনন্দ, নিরানন্দ কেবল হতভাগার প্রাণে অজানিতভাবে চিৎকার করিতেছে। মহালয়ার দিন বিকালে তিনি বেড়াইয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে খাগাতুয়া হইতে একজন রোগীর খবর লইয়া মানুষ আসিল, অমনি ঔষধের পোটলা- বাধা চাঁদরখানা বাহির বাড়িতে দাঁড়াইয়া শ্রীমান ক্ষেত্রমোহনের গলায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া পরাইয়া দিলেন এবং সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যাও বাবা রুগী দেখিয়া আইস। রুগীর বার্তাবাহককে বলিলেন- এই যে, প্রথম রুগী দর্শনে যাইতেছে তাহাকে উপযুক্ত ভিজিট দিয়া দিও। আমি নিকটে দাঁড়াইয়া রহস্য দেখিতেছিলাম, প্রাণ কাঁপিতে ছিল। হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম- বাবা আজ এই প্রথম, অমাবস্যা দিন সে রুগী বাড়িতে যাইবে, তাহাতে তিনি অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন- হ্যাঁ, আজই সে যাইবে, এই কথার উপর আর কোন দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য হইল না আর কোন বাক্যস্ফুর্তি হইল না। শ্রীমান খাগাতুয়া রুগীর বাড়িতে চলিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মাতাঠাকুরানী, আমি, পিসী এবং অন্যান্য শিশু ভাই-ভগ্নী সকলেই চারিদিকে বসিয়াছি। ভগ্নী শ্রীমতী হেমন্ত তিন চার মাস পূর্বে জ্বর-প্লীহা রোগে আক্রান্ত হইয়া এখানেই আসিয়াছে, সেও নিকটে বসা। কিছুকাল পর ক্ষেত্রমোহন বাড়ি আসিয়াছে, সেও নিকটে উপবিষ্ট। এমতাবস্থায় পিতা তামাক খাইতেছেন আর ঈষৎ হাসিতেছেন এবং বলিতেছেন- আমি আর বাঁচিব না আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তোমাদিগকে কিছু দিয়ে যেতে পারিলাম না। যাহা উপার্জন করিয়াছি তাহা খরচও করিয়াছি, তোমাদের কেহও উপার্জনক্ষম হইলে না। বসন্ত ও মহেন্দ্র নিতান্ত অবিবেচক, অস্থির মনা ও হিংসাপরায়ণ এবং বদরাগী, না জানি তোমাদের কত কষ্ট হয়। তবে আমার পিতাও আমাকে কিছু দিয়া যান নাই। যে প্রকারেই হউক ভগবান সংসার লীলা পূর্ণ করিয়াছেন। আমিও তোমাদিগকে কিছু দিয়া

যাইতেছি না। তবে এইমাত্র ভরসা আছে যে ইহ জীবনে ভ্রমক্রমেও কোনও পাপ করি নাই, কি উপহাসচ্ছলেও কাহারও মনে কষ্ট দেই নাই, ইহাতেই তোমরা নিশ্চয় অন্নকষ্ট পাইবে না।

হেমন্তেরও বাঁচিবার আসা নাই, তবে আমায় আর দেখিতে হইবে না, আমি চলিয়াছি কোনও ভয় নাই ভগবান রক্ষা করিবেন ও পালন করিবেন। পিতামাতা লইয়া কেহই জীবনবধি রহিতে পারে না ইত্যাদি কথা বলিতেছেন আর আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছি, মা ও পিসীমা হাসিতেছেন। হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ কোনও বিশেষ কষ্ট শরীরে নাই, কাজেই তাঁহারা রহস্যচ্ছলে সকল কথা নানা কথা দ্বারা উড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমার প্রাণের ভয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তার পূর্বের দিন আবার পুষ্করিণীতে কে জানি কে একজন একটা বড়সী ফেলাইয়াছিল, তাহাতে একটা বড় রুই মাছ আটকিয়া বড়সী লইয়া পুষ্করিণীতে খেলিতেছিল। দেখিতে পাইয়া আমি উঠাইলাম, বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কথিত দিনে পিতৃদেবের নিতান্ত প্রিয়বন্ধু লক্ষীকান্ত কর্মকারকে নিমন্ত্রণ করাইলেন। দুই প্রহরে তাহাকে বসাইয়া বলিলেন- আমি কিন্তু চলিয়াছি তুমি আরও অনেক দিন আছ। আমার চক্ষুর উপর এই তোমার শেষ ভোজন ইত্যাদি। লক্ষিকান্ত কর্মকারও সেই কথায় নানা কথা বলিয়া রহস্য করিয়া ভোজন শেষ করেন। ইহার পর রাত্রিতে ঐ সকল ঘটনা কথোপকথন এক রকম ক্ষান্ত হইলে, মা পিতৃদেবের জন্য ভাত আনিতে পাকের ঘরে গেলেন। সকল ভাত-ব্যাঞ্জনসহ থালা হাতে লইয়াছেন হঠাৎ হাত হইতে উলটিয়া পড়িয়া গেল। বাবা হাসিয়া বলিলেন আমার আর অন্ন নাই। আবার মা থালায় করিয়া ভাত আনিলেন, যৎসামান্য কিছুমাত্র আহার করিয়া আচমনান্তে বিছানায় বসিলেন এবং আমাকে বলিলেন- বাবা আজ তুমি আমার বুকে ঘুমাইবা, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া মাথা নোয়াইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আহার করিয়া আসিয়া পিতার বুকে শুইলাম তাহাতে তিনি বলিলেন- আমার পায়ে ভক্তি কর, ভক্তি করিলাম। প্রায় এক মিনিট পরে উঠিতেছি, বলিলেন- না হয় নাই আরও কতক্ষণ থাক, পড়িয়া রহিলাম, চার পাঁচ মিনিট পরে বলিলেন- উঠ। উঠিলাম, বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন ও আমাকে লইয়া শুইলেন এবং বলিতে লাগিলেন- আমি তো যাইতেছি, ভগবানে ভক্তি রাখিও। কোনও ভয় নাই অহঙ্কার করিও না, শক্র মিত্র সমজ্ঞান করিও, কাহারও অনিষ্ট করিও না ইত্যাদি। অনেক অনেক উপদেশের পর বলিলেন- পশ্চিম পুষ্করিণীর উত্তর পশ্চিম কোনে হিজল গাছের নীচে আমার শবদাহ করিবে। বেটা ভয় কি তুমি ত কত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ- সংসারে চিরজীবী কেহ নাই। এই সকল কথার পর নিদ্রা গেলেন, আমিও ঘুমাইলাম। সকালে প্রায় দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে জাগিয়া পায়খানা করিয়া হাত মুখ ধৌত করিয়া প্রাত-কৃত্যঃ সমাপনান্তর সন্ধ্যা করিলেন, ইহার পর আমি জাগ্রত হইলাম।

তিনি সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্যের পর সমাগত রুগীদিগকে ঔষধ প্রদানে বিদায় করিলেন এবং ঘরে খাটের উপর বিছানা ছিল তাহাতে শুইয়া রহিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে এমন সময় আমাকে বাহির বাড়ি হইতে ডাকাইয়া নিকটে আনিলেন ও বলিলেন- নাপিতকে সংবাদ দিয়া আনয়ন কর আমি ক্ষৌরী হইব। নাপিত আনান হইল, বসিয়া ক্ষৌরী হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন- ভাই, এই আমার শেষ ক্ষৌরী, আমি চলিয়াছি এই শেষ দেখা। তাহাতে সে নানাবিধ রহস্যপূর্ণ বাক্য আলাপাদির পর বিদায় হইল। তিনি বিশেষভাবে হাত-মুখ শরীর প্রক্ষালনান্তর খাটের নীচে মাটিতে বিছানা পাতিয়া বসিলেন ও কিছু আহারের আয়োজন দিতে বলিয়া অতি যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া আচমনান্তর তামাক খাইতে লাগিলেন। তখন ছোট খুড়া মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রোগী দেখিতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বারে বারেই তাহার আসিবার অপেক্ষা দেখিতে লাগিলেন ও পথপানে চাহিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, মধ্যমা ভগ্নী নির্মলা স্বামীর বাড়িতে ছিল, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া একটুকু দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও পরে নানাবিধ আলাপ আলোচনা হইতে হইতে ছোট খুড়া মহাশয় বাড়ি আসিলেন। বাড়ির প্রাঙ্গণে আসিয়াছেন, দেখিয়াই বলিলেন- মহেন্দ্র আসিয়াছ ? তোমার অপেক্ষা- তুমি অন্য ঘরে যাইও না, সত্বর আইস, আমি চলিয়াছি। এই কথা শুনিয়া খুড়া মহাশয় নিকটে গেলেন ও কি হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। বলিলেন- কিছু হয় নাই, আমার যাইবার সময় হইয়াছে, সংসার পরিবার তোমার উপর- সকলকে দেখিও। এই কথা বলিয়া উপবিষ্ট অবস্থাতেই চক্ষু নিমিলীত করিতে লাগিলেন।

ছোট খুড়া বলিলেন- বায়ু চড়া হইয়াছে শীঘ্র লক্ষ্মীবিলাস বটী আনয়ন কর, অমনি আবার ঈষৎ হাসি দিয়া বলিলেন, তুমি ভ্রান্ত ! বটী আর কে খাইবে ? এই কথা বলিতেছেন এমন সময় আমি দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে অবস্থা ভাল নয় মনে করিয়া মধ্যমা ভগ্নীকে আনাইবার জন্য লোক অনুসন্ধান করিতে পাড়ায় গেলাম। তখনও তৎক্ষণাৎই যে লীলা সংবরণ করিবেন সে কথা আমার মনে হইল না। এদিকে বাড়িতে কান্নার উচ্চ শব্দ শুনিয়া আবার দৌড়িলাম, আসিয়া দেখি বারিন্দায় আনিয়াছেন- চক্ষু নিমিলীত, হৃদপিণ্ড ঘন ঘন চালিত হইতেছে, দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্তধামে চালিয়া গেলেন।

সেদিন বৃহস্পতিবার- গ্রামের বাজার ছিল, এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য হইল। অনেক সময় পর তাহারই পূর্বকথিত স্থানে- শ্মশানে নেওয়া হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে। তবুও স্নান করাইবার সময় শরীর গরম, নিতান্তই জীবিত অবস্থার ন্যায় গরম ছিল। শ্মশান সজ্জিত হইল, জীবনের অবলম্বন আনন্দময় মূর্তি শ্মশানে উঠাইয়া দিয়া কান্দিতে কান্দিতে বাড়িতে আসিলাম। সেই পরম সুন্দর কলেবর অগ্নিতে ভস্মীভুত

হইল, কিন্তু স্মৃতি মুছিল না -

যে গেছে সে চলে যাক
স্মৃতি কেন রেখে যায়
ঘোর অনলে জ্বলতে শুধু
গরল কেন মেখে যায়।

জন্ম ও মৃত্যুতে বিধাতার কি কর্মকৌশল দেদীপ্যমান মায়ামুগ্ধ জীব আমরা কি ভুলিয়া হৃদয়ের অনল হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া সকলেই আবার সেই তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াই, না জানি ইহার ভিতরে কি রহস্য দেদীপ্যমান। মৃত্যুর সাত আট দিন পর স্বপ্নে দেখিলাম সুস্থ কলেবর হাস্যমুখ, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন- বৎস ভয় নাই আমি জ্যোতির্লোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমান ক্ষেত্রমোহন দেখিল, তাহাকে বলিয়াছেন আমি জ্যোতির্মণ্ডলে নক্ষত্র লোকে স্থান পাইয়াছি,- আশ্চর্য হইলাম, বিধাতা তোমার লীলার রহস্য কে ভেদ করিবে।

কাল তরঙ্গ ত্বরিত ধায়
বিশ্ব আপনা হারা ভাসিয়া যায়।

আর কিছু বুঝি না জানি না। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মৃত্যুর পর দেশশুদ্ধ আপামর সাধারণ লোক পিতৃদেবের জন্য কান্দিয়াছিল ও কান্দিতেছে। তিনি এরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন যে, রোগী শোকী, দুঃখী- তাপি তাহার কথা শুনিলে এবং অমায়িকতা দেখিলেই যেন সব ভুলিয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ পিতামাতা সন্তানকে কত তাড়না করে কিন্তু আমাদের জীবনে কখনও কোনও বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইতে তাহাকে দেখা যায় নাই এবং কেহ কখন দেখিয়াছিল বলিয়াও বলে না। তৃতীয়তঃ ব্যবসায় উপলক্ষে কখনও কাহার নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও চাহিয়া নেন নাই। তাহার কর্তব্য তিনি সম্পূর্ণভাবে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমান মনোযোগে সম্পাদন করিয়াছেন। যাহার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে সে তাহাই দিয়াছেন এবং তাহাতেই নিতান্ত সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন ও এই উপার্জ্জন দ্বারাই এই দুর্দ্দিনে বহুজনপূর্ণ এত বড় পরিবার প্রতিপালন করিতেন। কখন কিছু অভাব হইলেও তাহার কিছুকাল পরেই ভগবান তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেন। তবে একটি মাত্র বিষয়ে দুঃখিত ছিলেন,- পূর্বে পিতামহ বৈদ্যনাথ দত্ত যে তালুক আনয়ন করেন তাহা কালক্রমে ঋণের দায়ে জ্যেষ্ঠ উদয় দত্ত এবং অক্রুর দত্তের মাতুল শিবচরণ চৌধুরীর নামে বেনামা করিয়া রাখা হয়। ভগবানের কি ইচ্ছা উক্ত চৌধুরীর ঋণ হইতে সেই তালুক ঘটনাক্রমে নীলাম হইয়া সর্বস্বান্ত ও অনুতপ্ত হইতে হয়। আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি রায়তি স্বত্বে চার টাকা মাত্র জমা, ইহাতে তদানীন্তন তালুকদার পাল বংশীয়গণ জমা ভাঙ্গিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন ও অযথা নানা কারণে হুকুম চালাইতে চেষ্টা করিতেন। এই

সকল উদ্ভাবন করিতেন ও অযথা নানা কারনে হুকুম চালাইতে চেষ্টো করিতেন। এই সকল কারণে পরে আবার পূর্বের তালুক নীলামের বহুকাল পর ১৩০২ বাংলা সনে পিসা ঈশানচন্দ্র সেন অক্রুরচন্দ্র দত্তের অংশের অর্দ্ধেক খরিদ করিয়া এখানে আসিবার প্রস্তাব করিলে, গ্রামে জগৎ পালের কতক অংশ ঋণের দায়ে বিক্রিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার তিন গণ্ডা অংশ ছয় শত টাকাতে খরিদ করা হয়। সেই অনুসারে ছয় কড়া বা অর্দ্ধাংশের মালিক আমার পিতৃদেব, খরিদের টাকাও অর্দ্ধেক কর্জ্জ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ঋণ আর পরিশোধ হয় নাই, তজ্জন্যই মাঝে মাঝে বড় ক্ষুন্নমনা হইতেন। আবার বলিতেন- ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি চিন্তা করিয়া কি করিব, আমি কি, আমি কে- এই বলিয়া গান ধরিতেন।

তোমার কর্ম তুমি কর ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
না বুঝিয়ে ভ্রমে ভুলে কেবল করি আমি আমি।

পিতৃদেবের জীবন যবনিকা পতিত হইল, আমরা কালস্রোতে ভাসিলাম।

আমার জীবনে কতকগুলি ঘটনা লিখিব মনে করিয়া আনুষঙ্গিক এত কথা লিপিবদ্ধ করা হইল। কারণ এই সকল রহস্যের সঙ্গে এই জীবনের অনেক সম্পর্ক রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

গ্রাম্য পাঠশালা

বাড়িতে গ্রামস্থ রামজীবন চক্রবর্তী নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাঠশালা ছিল তাহাতেই প্রথম আমার হাতে খড়ি বা অ, আ, ক, খ আরম্ভ হয়। আমার পরে আঁতুড় ঘরে আমার একটা ভাই জন্মিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ও ইহার পর অনেকদিন আর কোনও সন্তানের জন্ম না হওয়াতে আমি অনেকদিন মায়ের স্তনের দুগ্ধ পান করি। পাঠশালায় পড়িতে আসিয়া কিছু কিছু লেখাপড়া করিয়া যাইয়াই মায়ের কোলে বসিয়া স্তন্য পান করিয়াছি। আর শৈশব বেলাতে প্রায়ই ফল, ফুল, পাতা দিয়া পুজা পাতিয়া পুরোহিত সাজিয়া পূজা দেওয়ার খেলা, মন্ত্র পাঠ করাই আমার বিশেষ অভিপ্রেত খেলা ছিল। মা বলেন তখন হইতেই নাকি আমি আপনা আপনি আকাশের দিকে তাকাইয়া, ফল, ফুল, গাছের পাতার দিকে তাকাইয়া মনে মনে বিড় বিড় করিয়া নানা কথা ঠোট নাড়িয়া বলিতাম। তাহাতে দিদিমা গালে ঠোনা মারিতেন। এইভাবে পাঠশালাতে ক্রমে প্রথমভাগ শেষ, দ্বিতীয় ভাগ একবার শেষ করা হইল ও তারপরেই পাঠশালা উঠিয়া গেল। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে আমাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

কৈশোর

নিরমল কাঁচে ধুলিবালি কণা
পড়িল ক্রমেতে আসি।
যথা পূর্ণ চাঁদে জলদ লহরী
ক্রমেতে ঘেরিল হাসি।
লাভালাভ জয় সুখ দুঃখ ভয়
মান অপমান আদি।
মানবের কর্ম সামাজিক ভাব
হৃদয়ে পশিল যদি।
অহঙ্কার মনে বিভোর হইয়ে
লাগিনু করিতে কাজ।
তবু ছিল সুখ সংসার বাসনা
পড়ে নাই শিরে বাজ।
সমপাঠী সনে আমোদে মাতিয়ে
খেলিনু কতই খেলা।
ভাবনার ঘোরে পড়িনি তখন
পাইনি দুঃখের জ্বালা।
হৃদয় প্রান্তরে শান্তি স্রোতস্বিনী
বইত তখন (ও) বেগে।
বাল্যসখা সনে মিলিয়ে মিশিয়ে
পান কৈনু কত সুখে।
কে জানিত মনে মহাকাল কলী
পশ্চাতে বসিয়া হায় !
সুখের পাথারে উদগারী গরল
বিপথে লইয়া যায়।
স্বপনের খেলা মায়া মরিচিকা
ভাঙ্গিল দুদিন পরে।
খাদ্যোতের আলো খেলিয়ে মুহূর্ত
ডুবিল আঁধার ঘরে।

স্বচ্ছ নিরমল নিবিড় কালিমা
ঢাকিয়া ফেলিল আসি।
কে জানে এমন বিষাদ জলদে
ঢাকিবে পরাণশশী।
চকোর চকোরী মন- আত্মাপাখী
বিমুখ হইয়া রবে।
কুলটা প্রবৃত্তি মেঘবাণী বধু
প্রবৃত্তি পুরায়ে লবে।
গগনের শশী ফুটেত আবার
দুদণ্ড দু'দিন পরে।
চকোরিয়া বধু সুখে সুধা পান
করয়ে আমোদভরে।
মম হৃদি চাঁদ আর কি ফুটিবে
আত্মা চকোরিণী হায়।
মিটাইয়ে সাধ পিয়িবেক সুধা
আনন্দ গাইবে তায়।
অভাগা জীবনে হবে কি তেমন
মুছিবে কালিমা রাশি।
সতেজে মাতিয়া হৃদয় ফুটিবে
উঠিবে শরৎ শশী।

গ্রাম্য স্কুল

প্রায় সাত বৎসরের সময় মদন মোহন তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় ভাগ লইয়া স্কুলে ভর্তি হই। ইহার দুই তিন বৎসর পরে মাঝে মাঝে পায়ে বেদনা হইয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতাম। তখন স্বামীজীর অনুগ্রহে রক্ষা পাই। ইহার কিছুকাল পরে একবার বর্ষাকালে স্বামীজী সাতমোড়া আসেন, তখন আমার ভয়ানক জ্বর হয়- পিতৃদেব যাইয়া জানাইলেন, তাহাতে তিনি একটি নাম প্রদান করেন। কিন্তু সেই নাম জপে কিছুই হইল না, তাহাতে পিতামহাশয় নিতান্ত অনুরাগের সহিত আবার যাইয়া জানাইলেন। তিনি বলিলেন- কি এখনও জ্বর সারে নাই, আপনি বাড়ি যান। মাকে যাইয়া বলুন এই নামটি

নাভিতে তিনটি তুলসীপত্র দিয়া তিনশত বার জপ করিয়া মাটিতে বাম পায়ে সাতটি আঘাত করিবার জন্য, এখনই জ্বর ত্যাগ হইবে। বাস্তবিক এই কার্য করা মাত্রই একবারে নিঃশেষে জ্বর পরিত্যাগ হইয়া গেল ও সুস্থ হইয়া সেই দিনই ভাত খাইলাম।

পিতামহাশয়ের পিত্তশূল রোগ আরোগ্য হওয়াতে স্বামীজীর প্রতি পিতামাতা এবং বাটিস্থ অন্যান্য সকলেরই অসাধারণ ভক্তি বিশ্বাস ছিল এবং যে কোন বিপদ সম্পদের কাজ স্বামীজীর আদেশ না নিয়া প্রায়ই কিছু করা হইত না। আমি কেবল পরীক্ষায় পাশ হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু নাম জপ করিতাম এবং মনে হইত তিনি ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে পারেন। এই বিশ্বাসে যথেষ্ট ভক্তি ও জপ করিতাম,- এমতাবস্থায় কিছু কাল পরে ১২৯৬/৯৭ মধ্যে বার বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। স্কুলে সাহিত্য ও ইতিহাস বেশ ভাল বুঝিতাম, কিন্তু গণিত জ্যামিতি প্রভৃতি এক রকম চালাইয়া নিতাম। সমপাঠী ছাত্রদের মধ্যেও সহযোগিতায় সমকক্ষই ছিলাম। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমপাঠীগণ যার যার সুবিধামত ইংরেজী পড়িতে চলিল। আমারও মনের ঐকান্তিক বাসনা, অথচ খুড়াদের পূর্বে মাঝে মাঝে যেরূপ উৎসাহের আলাপ শুনিয়াছি যে, নেংটি বেচিয়া আমাকে পড়াইবে। এই সকল বাক্যে প্রাণে এতই কৌতুহল যে, খুব ভাল লেখাপড়া শিখিয়া বড় বিদ্বান হইব এবং সংসারের বাজারে মানুষ, যাহাকে বড় মানুষ বলে সেইরূপ বড় মানুষ হইব। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, বৎসর গেল, সমপাঠীগণ শহর হইতে বাড়িতে আসিয়াছে ও মনে বেশ স্ফূর্ত্তি কিন্তু আমার হৃদয়ে আগুনে জ্বলিতে লাগিল। সমপাঠীরা দেখা করিতে আসিলে ভয়ে লুকাইয়া থাকি। এমতাবস্থায় নিতান্ত পীড়াপীড়িতে বড় খুড়া মহাশয় মুরাদনগর লইয়া গেলেন। সেখানে গ্রামস্থ মহেন্দ্র পাল আদালতে কাজ করিতেন, তাহার বাসায় আমাকে দিয়া আসিলেন। ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হইলাম, হৃদয়ের ভার একরকম কমিয়া গেল। কিন্তু সমপাঠীগণ এক শ্রেণী উপরে পড়িতেছে এই কথা মনে হইলেই বড় বিষণ্ন হইয়া পড়িতাম। এই ভাবে দুই তিন মাস কাটিল,- তখন রহিমপুরে ন্যাংটা ফকির নামে একজন খুব বড় ফকির বাস করিতেন, তাঁহার সঙ্গে যাইয়া দুইদিন সাক্ষাৎ করিলাম ও অভাব অভিযোগাদি জানাইলাম। তিনি আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু কি বলিয়াছিলেন মনে নাই। এইভাবে প্রায় পাঁচ ছয় মাস কাটিয়াছে। এমতসময় জ্যৈষ্ঠ মাসের বন্ধের সময় বাড়ি আসিলাম। গ্রামে দলাদলি উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্র পাল বিপক্ষ হইলেন, তাহাতেই সেদিকের দরজা একমত বন্ধ হইল।

যৌবন

তড় তড় করে ধাইল যৌবন
জীবন সলিলে ভাসি
বল বীর্য্য শক্তি বাড়িল ক্রমেতে
বদনে ফুটিল হাসি
ছলনা চাতুরী হিংসা নিন্দা ঘৃণা
পাশব আচার যত
মিশিয়ে শরীরে উত্তেজনা করি
রণেতে করিল রত
কপটতা অসি কটুবাক্য বাণ
সম্বল হইল সাথে
বাছিয়া বাছিয়া বিষাস্ত্রে হৃদয়
পুরিনু অহংমদে
হায় মূঢ় মন জান না কি তুমি
এ বাণে আত্মসংহার
মরিতে হইবে মনে বুঝি নাই
তাই এত অহঙ্কার
তোমার সন্ধানে বিধিবে তোমায়
ভুগিবে এ পাপভোগ
জানিয়ে শুনিয়ে হেন দশা কেন
কেন তব হেন রোগ
কর প্রতিকার ভেষজ সেবন
ধর্মৌষধি কর পান
বিবেক প্রান্তরে ঘসিয়ে মাজিয়ে
প্রেম নীরে কর স্নান।

প্রায় সাত আট মাস কাটিয়া যাইতেছে কোথাও কিছু সুবিধা হইতেছে না, এদিকে সংসারেও খরচের অভাব যেহেতু পিতা একমাত্র উপার্জ্জন করে। খুড়া দুইজন বাড়িতেই বসিয়া আছেন, কোনও বিষয়কর্ম নাই। এমতাবস্থায় কি করিব, হঠাৎ শোনা গেল রাজধানী নূতন হাবেলিতে এট্রান্স স্কুল হইয়াছে, সেখানে ছাত্রদের বেতন দিতে হয় না, শুনিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। যেহেতু নিকটে পিতার মাতুল বাড়ি কেন্দুয়ায়, হয়ত সেখানে খোরাকী পাইব, স্কুলে বেতন নাই কাজেই আনন্দের কথা বটে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাওয়া সাব্যস্থ হইল। কিন্তু কেহই উদ্যোগী হইয়া আমাকে তথায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছে না। কি করি কিছুই ভাল লাগে না, প্রাণ কেবল আইচাই করিতেছে হৃদয় নিতান্তই দিনের দিন বিষন্ন হইতে লাগিল। প্রায় তিন চার মাস অপেক্ষা করিলাম। আমি যে এই ভাবে দিন কাটাইতেছি খুড়াদের সে দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। ইহা দেখিয়া একদিন রাত্রিতে শুইয়া মনে মনে খুব সাহসের সহিত জেদ বাঁধিলাম এবং মনে করিলাম রাত্রি প্রভাতে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া একাই তথায় চলিয়া যাইব। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম, রাত্রি প্রভাত হইল জাগিয়া বিছানায় বসিলাম, একটু ইতঃস্তত করিয়াই ছাতি ও চাদর লইয়া পূর্ব মুখে ছুটিলাম। হৃদয়ের আবেগে অবিরাম বেগে অশ্রু ছুটিল, কত কথা মনে পড়িয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সমপাঠীদের কথা মনে হইয়া আর বাড়ির লোকের শৈথিল্যে ভবিষ্যৎ জীবন হৃদয়ে উঠিয়া একেবারে অধীর হইলাম। ছুটিয়াছি দ্রুত বেগে; বাড়ির লোক মনে করিয়াছে হয়তঃ একটু যাইয়া ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তা নয় অদম্য গতি, চক্ষের জলে পথ দেখিয়ে পাই না- দৌড়িতেছি, কালীগঞ্জের বাজারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। তখন বয়স চৌদ্দ বৎসর কোন দিন কোথাও একা যাই নাই, পথও চিনি না, মনে ভয় হইল। কিন্তু আবার আবেগ ছুটিয়া হৃদয়ের দুর্বলতা দূরে ঠেলিয়া দিল, এক দৌড়ে নদীর পার খেয়া ঘাটে গেলাম।

ভগবান বিপন্নের আশ্রয়

খেয়া ঘাটে যাইয়া দেখি একজন মুসলমান ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, সে আমাকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, আমিও কথোপকথনের পর জানিলাম সে মোগরা যাইবে। উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া বড়ই আনন্দের সহিত রওয়ানা হইলাম। মোগরা যাইতে যাইতে বেলা দুই প্রহর প্রায় অতীত হইয়াছে। সর্বদা সকালে খাইয়া অভ্যাস, সেদিন মোটেও আহার নাই তার উপর জীবনে এই প্রথম বড় লম্বা পথ অতিক্রম করা, ক্ষুধায় শরীর কাঁপিতে লাগিল। সঙ্গীয় লোকটি বাজারে দাঁড়ায়া আমাকে পথ দেখাইয়া তাহার

গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিল, যতক্ষণ দেখা যায় চাহিয়া রহিলাম, পরে নিরাশ মনে ক্লান্ত দেহে চলিতে আরম্ভ করিলাম। নদীর পাড়ে যাইয়া আর চলিতে পারি না, কি করি ক্ষুধায় অস্থির, জলে নামিয়া পেট ভরিয়া খুব জল খাইয়া লইলাম এবং আবার চলিলাম। কিয়দ্দুর যাইয়াই আর দুইটি মুসলমান বালককে পাইলাম, তাহারা সেদিকে অনেক দূর যাইবে। তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, তাহারা চলিয়া যায় আমি হাটিতেই পারি না, শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, কি করিব অতি কষ্টে কেন্দুয়া গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যে আত্মীয়ের বাড়িতে যাইব বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, গ্রামে যাইয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, আবার কত কি মনে করিতে লাগিলাম। অগত্যার পর অনন্যোপায় হইয়া যেন মরার মতন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহারা দেখিয়া অবশ্য আনন্দিত হইল এবং তখনই দুই প্রহরের যাহা ভাত ছিল তাহা খাইতে দিল, খাইয়া বারিন্দায় বসিয়াছি, বোধ হয় এক ঘণ্টা কাটিয়াছে এমন সময় দেখি পিতৃদেব যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে দেখিয়া আকৃষ্ট হইল আমিও লজ্জিত হইলাম। তিনি নাকি আমি রওয়ানা হওয়ার অল্প পরেই পাছে পাছে রওয়ানা হইয়া আসিয়াছেন, ক্রমে সেখানে সকল বিষয় প্রকাশিত হইল। তাহাতে তিনি ভাল দিনে লইয়া আসিবেন বলিয়া বাড়ির অভিমুখে আমাকে নিয়া রওয়ানা হইলেন।

ইংরেজি পড়া

অল্প কয়েকদিন পরই তথায় যাইয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। কেন্দুয়া হইতে প্রায় তিন মাইলেরও কিছু বেশি পথ হইবে প্রত্যহ আসা যাওয়া করিতে হইত। প্রাতে প্রায় আট কি সাড়ে আটটার সময় আগের দিনের পান্তা বা ঠাণ্ডা ভাত বাসী ব্যঞ্জণ, কচিৎ কোনদিন গরম ভাত বেগুন সিদ্ধ খাইয়া চলিতাম। বিকালে পাঁচ কি সাড়ে পাঁচটায় আসিয়া দুই প্রহরের রান্না করা ঠাণ্ডা ভাত খাইতে হইত। তবে সমবয়স্ক আরও দুই তিনটি ছেলে তথা হইতে স্কুলে যাওয়া আসা করিত তজ্জন্য মনে বড় কষ্ট হইত না, কিন্তু বাড়ির গিন্নি বড়ই বিরক্ত ভাবিতেন। দ্বিতীয় আর এক যন্ত্রণা- কর্তার দুইটি ছেলে নিতান্ত অনাবিষ্ট ও দুষ্ট, তাহাদিগকে প্রথম ভাগ পড়াইতে হইত। কথা শুনিত না, গালিগালাজ মারধর করিয়া জ্বালাতন করিত, কেবল বাড়িতে বিধবা পিতার মধ্যমা মাতুলানীর অতুলনীয় স্নেহে কতক শান্তি লাভ করিয়া কতকদিন কাটাইলাম- সাত আট মাস পরে ১২৯৯ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে বন্ধের সময় বাড়িতে আসিলাম।

সেখানকার কষ্ট অত্যাচারে পিতামাতার মন ও নিজের মন ফিরিয়া গেল। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অন্য চেষ্টায় বাড়িতে বসিয়া দিন গুনিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যেই বড় খুড়া কলহ করিয়া বাড়ি হইতে আরাকান চলিয়া গেলেন। ছোট খুড়া পৃথকান্ন হইলেন এবং দুই তিন মাস পর হঠাৎ এক সময়ে পিতামাতা ও ছোট খুড়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। এই জ্বরে ক্রমে সাত আট মাস পর্যন্ত তিনজনের ভোগ হয়, সময় সময় নিরতিশয় সাংঘাতিক অবস্থাও হইয়াছিল। এদিকে ১৩০০ সনের জলপ্লাবনে দুর্ভিক্ষ মহা বিভ্রাটে পতিত হইলাম, অতি কষ্টে নানা যন্ত্রণাতে দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। দয়াময়ের ইচ্ছায় তিনজনেরই রোগ আরোগ্য হইয়া শান্তি আসিল, এই সময়ে প্রায়ই স্বমীজীর নিকট চিঠিপত্র লিখিতাম ও উপদেশমত রোগ শান্তির জন্য নামাদি জপ করিতাম এবং মাঝে মাঝে কৌতুহলপূর্ণ লীলাময়ের লীলায় বৈচিত্রময় স্বপ্ন-দর্শন হইত। ক্রমে উপস্থিত ঘটনাতে শান্তিলাভ করিলাম সত্য কিন্তু আমার হৃদয়ের অনুতাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিছুতেই শান্তি পাই না। মাঝে মাঝে কৃর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করি ও গোপাল সাধুর আখড়াতে বসিয়া নানা ধর্মকথা শ্রবণে কিছু লাভ করি। এই সময়ে পুস্তক পাঠের পিপাসা নিতান্তবর্দ্ধিত হয়, মনে করিতাম যদি ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাই তবে যে কোন স্থলে বিনা বেতনে চাকর থাকিব। কিন্তু সে সময়ে সাধরণ বাজে পুস্তক ভিন্ন ভাল পুস্তক কোথাও পাওয়া গেল না- মনের আশা মনেই বিলীন হইতে লগিল। ইতিমধ্যে একদিন সমপাঠীগণ বাড়িতে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তাহাদের সাড়া পাইয়াই লজ্জায় ক্ষোভে নিতান্ত মর্মাহত হইয়া জঙ্গলে যাইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহারা আমাকে তালাস করিয়া ফিরিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ঘরে আসিলাম, ঘরে আসিয়াই এক মহান আনন্দ প্রাণের ভিতর উপস্থিত হইল- হৃদয়মধ্যে হইতে কে যেন আদেশ দিয়া বলিতেছে,- "ধর্ম উপার্জ্জন কর, সকল বিদ্যা পরাস্ত হইবে।" আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম, লাফাইতে লাগিলাম ও বলিতে লাগিলাম- ধর্মধন উপার্জ্জন করিব। তাহাতেই আমি সকল হইতে বড় হইব ইত্যাদি। কিয়ৎপরে মনে আসিল, কি ভাবে ধর্ম উপার্জ্জন হয়, স্ত্রী আর পুরুষে সংসার, স্ত্রী যদি পুরুষের নাম জপ করে আর পুরুষ যদি স্ত্রীর নাম জপ করে তবেই যেন যোগানন্দলাভ হইতে পারে। এমত কল্পনা, জল্পনা, সংকল্প, বিকল্প কিছুকাল আসিতে লাগিল, পরে সুস্থচিত্ত হইয়া মাঠে একা আপন মনে কতকক্ষণ বেড়াইয়া আসিলাম। বাড়িতে সমবয়স্ক কেহ নাই, নিকটেও নাই, তাস পাশা খেলিয়া গল্পগুজবে দিন কাটাইবার সুযোগ নাই, কাজেই গোপাল সাধুর আখড়া একমাত্র বিশ্রামের স্থল হইল। সর্বদাই সেখানে প্রাতে বিকালে রাত্রিতে নানা বিষয়িনী সদালাপে নিযুক্ত থাকিয়া বেশ আমোদভোগ করিতে লাগিলাম, আর নিরতিশয় অনুতাপ আসিতে লাগিল।

অনুতাপ

উহু উহু কেন, তপ্ত নিশ্বাস
হিয়া কাপে দুরুদুরু
নিরাশার ভোরে বিভোর হয়ে
সঘনে কম্পিত উরু
মুহুর্মুহু কেন ঘুরিতেছে মন
কেন বা নাহিক প্রীতি
হৃদয় মাঝারে আগুণ জ্বালিয়ে
দহিতেছে দিবা রাতি
স্বভাবের শোভা, সান্ধ্য সমীরণ
উষার মোহন হাসি
কোকিলের রব ভ্রমর গুঞ্জন
প্রফুল্ল কুসুম রাশি
স্নিগ্ধ পল্লবিত, লতিকা বেষ্টিত
অত্যুচ্চ বিটপীচয়
কল কল ধ্বনি নির্ঝরা তটিনী
শিখর তুষারময়
চাঁদের কিরণ খাদ্যোতের আলো
গগনে তারকা ভাস
মলয়পবন বিচিত্র বন
কিবা হর্ম্য তলে বাস
বীণার ঝঙ্কার, ললিত সঙ্গীত
মানস না হেরে আর
যেদিকে নেহারি, অগ্নি কণাময়
কভু হেরি অন্ধকার

(যেন)

প্রলয়ের ঝড় বহিছে চৌদিকে
তড় তড় শিলাপাত
সন্ সন্ সন্ খেলিতেছে ভাসি
মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত
ক্ষণে উল্কাপাত কাঁপিতেছে মেদিনী
হুঙ্কারিয়ে মহাকাল
মহা ভয়ে ভীত আড়ষ্ট শরীর
সম্মুখেতে মায়া জাল
লুকাইতে নারি সদা মনে লয়
গহন শিখরে যাই
ঘোর দুরাচার কপট আচারী
মানব যথায় নাই
হিংস্র জন্তু সনে কিংবা কাল ফনী
সহিতে করিতে বাস
চাহে মম মন মানব সমাজে
থাকিতে না করে আশ,
কিংবা অনশনে যায় এ জীবন
তাও ভাল মনে করি,
যায় যদি প্রাণ, জগত কল্যাণ
তায় কি কখন ডরি
ওহে ভগবান নিবেদি তোমায়
পুরাও এ আকিঞ্চন
বাসনা পাদপে ফলাও অমৃত
ঘুচাও ভব বন্ধন।

মোক্তারী পড়া

এইরূপ নিত্যনূতন অনুতাপে হৃদয় জ্বলিতে লাগিল, কি করিব কোথায় যাইব কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে খ্যাতনামা কলিকাতাবাসী উকিল সেরাজুল ইসমাইল খাঁ মহোদয়ের ভগ্নিপতি পিতা মহাশয়ের নিকট কোনও রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসিত হইবার অভিলাষে আমাদের বাড়ীতে আগমন করেন। তখন আমাকে দেখেন ও আমার সমন্ধীয় আলাপ হইতে হইতে তিনি মোক্তারী পড়িবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। পিতারও সম্মতি হইল- প্রাণে যেন একটু বল আসিল, একটু অবলম্বন পাইলাম। সে দিকেই মন কল্পনা জল্পনা, সংকল্প বিকল্প করিয়া কতক দিন কাটাইলাম। ইতিমধ্যে পিতৃদেব কোনও রোগী চিকিৎসার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান, তথা হইতে আইন পুস্তকের লিষ্ট আনেন। সেমতে কলিকাতা হইতে আইন পুস্তক আনাইলাম ও পড়িতে লাগিলাম। অনেকে বলিতে লাগিলেন বাড়ীতে থাকিয়া পড়ায় সুবিধা হইবে না, গ্রামস্থ যজ্ঞেশ্বর পাল মোক্তারের বাসাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলাম। আর একজন সঙ্গী জুটিল, একরকম অধ্যাপনা চলিতে লাগিল, খোরাকী উক্ত পাল মহাশয়ই দয়া করিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মোহরের কার্য্য করিতে হইত, ইহাতে নিতান্তই অসম্মান বোধ হইতে লাগিল। হুকুমজারী মোটেই সহ্য হইত না তবু সুখে দুঃখে কতকদিন কাটাইলাম পড়াতে বিশেষ মনোযোগ আসিতে লাগিল না, মন কেবল উদাস উদাস বোধ হইত।

নিতান্ত আত্মীয়কেও বিশ্বাস করিও না

ইহার মধ্যে একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, মোক্তারের এক মক্কেল আমার কাছে তিনটি টাকা দিয়ে গেল, টাকা তিনটি পুস্তকের ভিতরই রাখিয়াছি, নিকটে ঐ বাসারই একটি ছেলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবে, আমার কাছে বসিয়া সর্বদা লেখাপড়া করে ও কোনও বিষয় বুঝিয়া লয়- সে বসা ছিল। এমন সময় বাসার ভিতর হইতে কোনও কাজের জন্য আমাকে ডাকিল, টাকাগুলি পুস্তকের ভিতর রাখিয়াই পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলাম। মিনিটখানেক পরে আসিয়া দেখি ঐ ছেলেটি সেখানে বসা নাই, পুস্তক খুলিয়া দেখি টাকাও একটি নাই। ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল আমি তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম টাকাটি সে-ই নিয়াছে।

ইহার পর কতকদিন চলিয়া গিয়াছে, সেখানে মেলার সময় নাটকের বড় ধুম পড়িয়া গেল, এক সম্প্রদায়ে বাধ্য হইয়া যোগ দিতে হইল, কতক দিন আমোদে কাটাইলাম।

আমোদে মাতোয়ারা হইলে বিপদ ঘটে

তাহার মধ্যে একদিন একজন আত্মীয় আমাকে লইয়া বাজারে সার্ট খরিদ করিবার জন্য গেলেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া খরিদ করা হইল। আমার নিজ তহবিলে কিছু পয়সা ছিল, তখন মেলা বসিয়াছে। মিঠাই খাওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও একা ত কোনদিন নিজে খরিদ করিয়া খাওয়া হয় নাই। সেদিন প্রাণ মাতিয়া উঠিল, সঙ্গীয় ভদ্রলোকটিকে বলিলাম বাসায় যান, আমি আসিতেছি, তাহার পিরানখানা আমার বগলে ছিল। সন্দেশের দোকানে গেলাম, সামান্য কিছু লইলাম একেবারে আহলাদে আটখানা, তাড়াতাড়ি গালে পুরিয়া ছুটিলাম, আমি আত্মহারা কোন দিকে লক্ষ্য নাই। অল্প কতদূর আসিয়াই দেখি ঐ ভদ্রলোক ত-অমনি পিরানের কথা মনে হইল। চাহিয়া দেখি বগলে নাই, দৌড়িয়া ছুটিলাম- খুঁজিলাম, কোথাও নাই। সকল আনন্দ ব্যোম হইয়া গেল, হতভম্ব হইয়া লজ্জায় ক্ষোভে বাসাতে ফিরিলাম।

কিছুকাল পরে ফিস দাখিল করিয়া পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু পাশ হাইলাম না, মন বড় ভাঙ্গিয়া গেল। (১৩০৩ সনের জৈষ্ঠের শেষ ভাগে) মনে করিলাম রাজধানীতে (আগরতলা) ওকালতি পরীক্ষা দিব। পুস্তকাদি লইয়া তথায় গেলাম, দুই তিন দিন এক বাসায় রহিয়াছি, এমতসময় শুনিলাম সামান্য অপরাধে এক উকিলকে কালা পানি পার হইতে অর্থাৎ তথা হইতে নির্বাসিত হইতে হইয়াছে। বড়ই মর্মাহত হইয়া নানাবিধ চিন্তার পর মনে করিলাম একবার কেন কালীকচ্ছ যাইয়া স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না, তাহা হইলে তিনি যেমত উপদেশ দেন সেই মতই করা যাইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া তথা হইতে রওয়ানা হইলাম।

গুরু-ধাম কালীকচ্ছে (সরাইল) যাত্রা

আষাঢ় ১৩০৩ বাংলা।

রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোটেলে উপস্থিত হইলাম ও যৎসামান্য কিছু আহারাদির পর ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে জাগিয়া মনে করিলাম, পুস্তকগুলি আর বোঝা বহিয়া সেখানে লইয়া যাইব না, যেহেতু দুই তিন দিনের মধ্যেইত ফিরিয়া আসিব, তাই বলিয়া হোটেলের অধ্যক্ষের নিকট পুস্তকের বস্তা রাখিয়া জীবনযাত্রাতে রওয়ানা হইলাম। প্রায় দুই মাইল পথ বাকী আছে তখন এক বারুই বাড়ীতে জল পিপাসায় জলের জন্য যাইয়া দাঁড়াইলাম। জল দিল, ইচ্ছামত পান করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। কথাবার্তা আরম্ভ হইল- তখনই সেই বাড়ীর লোকটি স্বামীজীর নানা কলঙ্ক করিতে লাগিল। কিন্তু মন ভাঙ্গিল না, ভাবিলাম- ইহা আমার পরীক্ষা। তাহার কথাতে বড় বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া আবার ছুটিলাম। বেলা তখন দেড় প্রহর হইয়াছে এমন সময় ব্রহ্ম মন্দিরের দ্বারে গেলাম, যাইয়া দেখি অটল অচল মহাপুরুষ স্বকীয় জ্যোতিতে ঘর আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন, পার্শ্বে ময়মনসিংহ গোপালাশ্রম নিবাসী তীব্র অনুরাগী প্রিয়শিষ্য দ্বারকানাথ দত্ত উপবিষ্ট। স্বামীজী আমাকে দরজায় দেখিয়াই বড় আনন্দের সহিত বলিলেন- মনোমোহন আসিয়াছে, আমি আত্মাহারার ন্যায় শ্রীচরণে প্রণত হইলাম, হাত বুলাইয়া দিলেন, যেন আমার সকল ব্যাথা দূর হইয়া গেল- নিকটে বসিলাম। অমনি দ্বারকাকে বলিলেন- যাও দ্বারকা তাহাকে নিয়া গাছতলাতে যাও- কিছু জলখাবার দিতে বল, ছেলেমানুষ ক্ষুধা হইয়াছে। প্রাণ প্রিয়তম দ্বারকানাথ অসীম প্রেমভরে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ছোট পুষ্করিণীর পূর্ব-উত্তর কোণে লইয়া গেল। সেখানে দেখি কয়েকটি আম গাছ, দুই তিন খান কুঁড়েঘর, স্বামীজী তথায় রাত্রে থাকেন ও উপাসনা করেন এবং প্রিয় শিষ্য সকলকে লইয়া উপদেশ দেন। শিষ্যদের পাকাদি ও খাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানেই হয়, মাতাঠাকুরানী এবং তাঁরও অনেক শিষ্যা স্ত্রীলোক সেখানে আছেন। তথায় যাইয়া মাতাঠাকুরানীকে ভক্তি করিলাম- তিনি পরিচয় নিলেন। ইহার পূর্বে পিতৃদেব একবার আমাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন, তখন গাছতলায় ঘরের স্থানটি মাত্র পরিস্কার ছিল, আহারাদি বাড়ীর মধ্যে হইত, সন্ধ্যায় উপাসনা তথায় হইত। পূর্বের পরিচয়ে মায়ের কাছে পরিচিত হইলাম, জল খাবার দধি চিড়া দিলেন, খাইলাম ও তখনকার নিয়মমত সেখানে বসিয়া "সর্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নাম কিছু জপ করিয়া ও লম্বা ভক্তি দিয়া পুনরায় স্বামীজীর নিকট চলিয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন- তোমাকে এখানে সতের দিন থাকিতে হইবে, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিলাম। দ্বারকা আমাকে লইয়া দালানের উপরের কোঠায় গেল। সেখানে মহাজ্ঞানী ফরিদপুর নিবাসী প্রিয় ভক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, চৌদ্দগ্রাম নিবাসী গিরীশ চন্দ্র চৌধুরী, হরেন্দ্র চন্দ্রদাস, ললিত চন্দ্র ব্যানার্জ্জি এই সকল লোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অতি প্রিয় ভাবে আমাকে গ্রহণ করিলেন।

বেশ পরমানন্দে পড়িলাম, তখন প্রিয়বাবু গাছতলাতে প্লানচেট ধরেন ও নানা বিষয়িনী আলাপ আলোচনা, ভবিষ্যৎ বাণী, জপ ধ্যান সেখানে হইয়া থাকে। এই ভাবে দিনের পর দিন দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু প্রাণ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল, সেখানে আর থাকিতে ক্ষণমাত্রও ইচ্ছা হইতেছে না আবার চলিয়া আসিতেও মনে ভয় হইতেছে। স্বামীজীকে দেখিলে যেন সাক্ষাৎ যম-স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল, তিনিও আমাকে বড় ডাকেন না, উপেক্ষা ভাব বুঝিতে লাগিলাম, মন আর কিছুতেই শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। কে জানে ইহার ভিতরে তাঁহার কি কৌশল লুক্কায়িত ছিল। এমতাবস্থায় দশ বার দিন কাটিয়া গিয়াছে, একদিন প্রাতে স্বামীজীর নিকটে বসিয়া, মানুষকে যে সকল নাম প্রদান করিতেন সে দিনের মত আমি তাহা লিখিতেছি। নিকটে একটি ব্যবসায়ী

তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে নানাবিধ কূটকাটব্য প্রশ্নজাল উপস্থিত করিতেছে, তখন হঠাৎ আমার শরীর কম্পিত হইল, মন উত্তেজিত হইল, শিরায় শিরায় ধমণীতে ধমণীতে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, চক্ষু স্থির হইয়া গেল অতিমাত্র উত্তেজিত হইলাম। কিছু সুস্থির হইলাম, ঐ লোকটির সেই সকল বিষয় রাজ্যের প্রশ্ন জাল যেন আমার বক্ষে বিষমিশ্রিত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। আমি যেন কোন অজানিত আনন্দময়ের নির্ম্মল রাজ্যে পহুঁছিয়াছিলাম, সে কথার ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা নিতান্তই দুরূহ বটে। একমাত্র ভুক্ত ভোগীই তাহা বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। ক্রমে তিন চার দিন চলিয়া গিয়াছে, ধর্মবন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যৎপরোনাস্তি উৎসাহে ও আনন্দে চলিয়াছি। আর একদিন প্রাতে সেই দিনকার মত নাম লিখিবার জন্য নিকটে বসিয়াছি, স্বামীজী বালিশে ঠেস দিয়া অর্দ্ধ নিমিলিত অবস্থায় ধ্যানস্থ আছেন। লোকজন একরকম বিদায় হইয়াছে, বসিয়া বসিয়া নানা চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ যেন দেখিলাম একটি কালবর্ণ পুরুষ স্বামীজীর খাটের নীচে বসিয়া আছে, চমকিয়া উঠিলাম, স্বামীজীও উঠিয়া বসিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি দেখিলে ? আরও বিস্মিত হইলাম, ভাবিলাম ব্যাপারখানা কি ? তিনি কি মতে এই ব্যাপার বুঝিলেন, চিন্তিত হইয়াই বলিলাম- একটি কালবর্ণ পুরুষ দেখিয়াছি।

স্বামীজী– তুমি ইহাকে চিনিতে পারিয়াছ ?

আমি– না।

স্বামীজী– দেখ এক বৎসর হইল তোমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক বাড়ীতে সে আসিয়াছিল, তুমি দেখা করিতে গিয়াছিলে, কিন্তু যাইয়া শুনিলে সে চলিয়া গিয়াছে।

আমি– মনে হয় না।

স্বামীজী– ইনি একজন সাধক, উহার বাড়ী তোমাদের বাড়ী হইতে পনের ষোল মাইল দূরে, লোকটি কৃষ্ণভক্ত, ইহাতে কালীকাযোগ আসিয়াছে। আজ অনেকদিন যাবত স্বপ্নে অন্ধকার দর্শন করিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন এবং চক্ষু দুইটি অন্ধ হইয়াছে, আরও কতকদিন কাটাইতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইবেন। বড়ই উচ্চদরের লোক, সে যোগবলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে,– চিনিতে পার ?

আমি– না, চিনিলাম না।

স্বামীজী– তোমাদের গ্রামে খ্যাতনামা একটি মেয়ে গায়িকা আছে, ইনি তাহারই গুরু– চিনিতে পার ?

অমনি আমার মনে সকল বিষয় আনুপূর্বক বৃত্তান্ত জাগিয়া উঠিল। আমাদের গ্রামে রামায়ণ কীর্তনীয়া সোনাই নাম্নি নট্টবংশীয়া এক প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিল। সে নবদ্বীপ যাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার গুরু জাফরগঞ্জ বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ চন্দ্র মহন্ত,

বাস্তবিক তাঁহাকে শৈশবে দেখিয়াছি এবং এক বৎসর পূর্বে বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্বে তাঁহার শিষ্য কর্মকার বাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, অভাবনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিলাম-কৃষ্ণ চন্দ্র মহন্ত !

স্বামীজী– হ্যাঁ।

আমি– সে ত কালবর্ণ নয়, (গৌরবর্ণ ছিল)।

স্বামীজী– হ্যাঁ, এখন সে কালবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমি– সে কেমন করিয়া আসিল !

স্বামিজী– যোগবলে, এখনও আছে। দেখিবে ?

আমি– দেখিব।

অমনি তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং বলিলেন–আমার দিকে চাহিয়া দেখ,–পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু দেখিয়াছ ?

আমি– না, দেখি নাই।

(বাস্তবিক পরে যাইয়া উক্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম ঘটনা সত্য; ইহার প্রায় ছয় সাত বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।)

স্বামীজী– (একটি নাম বলিয়া) এই নামটি জপ কর।

আমি জপ করিলাম– স্বামীজী বলিলেন, দেখ– এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন– চাহিয়া দেখি,– কপালে, বক্ষে, হাতে, নাসিকায়, কণ্ঠে, বৈষ্ণবের সাদা তিলক– ঠিক একটি বৈষ্ণব। অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিয়াছি, একেবারে সম্বিদ হারা। তিনি ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন– দেখিয়াছ ! আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম– হ্যাঁ দেখিয়াছি, এই বলিয়া বড়ই অস্থির হইলাম। তিনি স্পর্শ করিয়া শান্তি দান করিলেন। এই রহস্যে মন প্রাণ বিগলিত হইল, অজানিত রাজ্যে মূহুর্মূহু মন ডুবিতে লাগিল এবং যেন কি এক আনন্দময় নির্ম্মল দেশের কল্পনা জল্পনা হইতে লাগিল। বিশ্বাসের বলে হৃদয় ভরিয়া গেল মনে আর নিরানন্দ নাই, নব বলে বলীয়ান হইয়া পড়িলাম। তাহাতে ভবিষ্যৎ জগতের অবতীর্ণ ভাব, মৃত মানুষ্যের আগমন বার্ত্তা, সাধকদের সিদ্ধাবস্থার আনন্দের কথা সর্বদা শুনিতে শুনিতে আমি যেন আর একরকম হইয়া পড়িলাম। তখন সংসার নাই, বিষয় নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, অনুতাপ নাই, মনে করিলাম সাধকতাই জীবনের কর্ত্তব্য।

এই ভাবে দুই এক দিনের পর আমার ঐ সতের দিন প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় আবার ডাকিয়া বলিলেন– মনোমোহন তোমার আরও সতের দিন থাকিতে হইবে, ইহাতে মনে আরও আনন্দ হইল তখন আর বাড়ীর কথা মনে নাই, প্রাণে মমতা নাই, অভিমান নাই, –আমি একজন নুতন মানুষ হইয়া পড়িয়াছি,– কেবল ঐ ভাবনা ঐ চিন্তা ঐ আলাপ, ঐ কথা দিবস-রজনী নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব সকলই আমার পক্ষে তখন নূতন এবং অমিয়মাখা বোধ হইতে লাগিল। এইভাবে সাত আট দিন পর

আর একদিন বিকালে যাইয়া সামনাসামনি ভাবে বসিয়াছি। স্বামীজীর দিকে চাহিয়াই শরীর শিহরিয়া উঠিল, মন উত্তেজিত হইল, চাহিয়া দেখি যেন দণ্ড-কমণ্ডুল হাতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু- চিৎকার আরম্ভ করিলাম, তখন সন্ধ্যার অল্প বাকী এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন– আরও দুই বৎসর বাকী বুঝিবা। এই বলিয়া আসন হইতে নামিয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, এবং টানিয়া গাছতলার দিকে লইয়া চলিলেন।

সেখানে নিয়া সুস্থ করিয়া বলিলেন, –

তুমি কি চাও ?

আমি যেন আত্মহারার ন্যায় বলিয়া উঠিলাম–নিষ্কাম ধর্ম

–স্বামীজী উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন নিষ্কাম ধর্ম ?

–ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়–

যা হক্ অদ্য হইতে তোমার মনে যে সকল কথা জাগরিত হয় তাহা লিখিয়া রাখিও।

মনে ভাবিলাম আমার একটা মনই বা কি, কি কথা আবার উঠিবে– কিবা লিখিব। যাক সে কথা– দেখি কি হয়। ক্রমে ধর্ম বন্ধুদের সঙ্গে মাখামাখি করিয়া অকপট প্রেমে মিলিত হইয়া, মহাপুরুষের চরণামৃত পানে দ্বিতীয় আদেশের সতের দিনও অতীত হইল। সেদিন সন্ধ্যার সময় ডাকিয়া বলিলেন– অদ্য তোমার সঙ্গে স্বপ্নে রাত্রিযোগে হযরত মহম্মদ (দঃ) আসিয়া দর্শণ দান করিবেন। বাস্তবিক তাহাই স্বপ্নযোগে শ্বেতশশ্রু একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন– আমার নাম মহম্মদ তোমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছি। প্রভাতে জাগিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিতে গেলাম– দেখিয়া গুরুদেব হাসিলেন, আমি বলিলাম হযরত মহম্মদকে (দঃ) তো দর্শন লাভ করিলাম। তখন বলিলেন আরও পাঁচ দিন তোমার থাকিতে হইবে। আমার আর দ্বিরুক্তি নাই, তবে বাড়ী হইতে দুই তিনখানা চিঠি আসিয়াছে, শেষে পিতামাতা অভিভাবকগণ কি বলেন মাত্র এইটুকু ভয় হইয়াছিল, তাহাও আবার ক্ষণমাত্র থাকিয়াই লয় হইয়া ধর্মভাবে মন বিভোর হইয়া যাইত।

এই ভাবে সেই কয়েকদিনও কাটিতে লাগিল, খুব সুন্দর সুন্দর দেবদেবী মহাপুরুষগণকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে স্বামীজীর নিকট দাঁড়াইলেই কোন্ দিন রাত্রিতে কি দেখিয়াছি তিনি একটু ধ্যানস্থ হইয়া বলিয়া দিতেন ও অর্থ বুঝাইয়া দিতেন এবং ভবিষ্যৎ আশাতে উৎসাহিত করিতেন।

এইভাবে সেই পাঁচদিনও কাটিয়া যাইতে লাগিল অনেক লোকের সঙ্গে অকপট বন্ধুত্ব পাইয়া যৎপরোনাস্তি তৃপ্তি লাভ করিলাম এবং স্বামীজী বলিলেন–

১। তোমার বিষয় হইবে না।
২। দুই বৎসর পর আত্মজ্ঞান আসিবে।

৩। ছয় বৎসর কাল সাংসারিক বৈষয়িক যন্ত্রণায় ভুগিতে হইবে।
৪। ছয় বৎসর পর দুই বৎসর কাল উন্মাদ অবস্থায় ঘুরিতে হইবে।
৫। এই আট বৎসর পর আরও ছয় বৎসর কাল উঠাপড়া ভাব আসিবে।
৬। এগার বৎসর পর বিশুদ্ধ ভাবের অনেকটা আভাষ পাইবে।
৭। চৌদ্দ বৎসর পর বিশুদ্ধ ব্রক্ষযোগ আসিবে।

আমার হৃদয়ে নিম্নলিখিত ভাব জাগরিত হইল ঃ

১। নিষ্কাম ধর্ম উপার্জন করিব।
২। ভালবাসাই ধর্ম সাধনের মোক্ষ পথ।
৩। আমি ও ব্রক্ষময় জগৎ একই পদার্থ।
৪। মানুষের স্বাধীনতা নাই, নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে মহাশক্তি প্রেরণায় প্রত্যেকেই চালিত।
৫। মানুষ দেব ভাব লাভ করিতে পারে।
৬। মন্ত্র সকলের অর্থ প্রার্থনা।
৭। আমার হৃদয় অনন্ত জ্ঞানের খনি, সকল বিদ্যা ও তত্ত্ব হৃদয় হইতেই লাভ করা যাইতে পারে।

এই সকল তত্ত্ব ও আশা হৃদয়ে লইয়া পরমানন্দে স্বামীজীর শ্রী চরণে প্রণাম করিয়া ধর্ম ভ্রাতাদের সহিত প্রেমালিঙ্গনে বিদায় হইয়া বাড়ী অভিমুখে ছুটিলাম। কিন্তু আমাতে যেন আমি নাই, যে মনোমোহন একমাস পূর্বে কালীকচ্ছ গিয়াছিল, ভেবে দেখি অদ্যকার মনোমোহন আর সে মনোমোহন নয়, সম্পূর্ণ বদল হইয়া নূতন হইয়া গিয়াছে, যেন ঠিক পুনর্জন্ম হইয়াছে। প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছি, পথ হাটিতেছি কিন্তু আত্মহারা। হঠাৎ চমকিত হইলাম–এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলাম, শূন্যপানে তাকাইলাম– চেয়ে দেখি অনন্ত সূক্ষ্ম শ্বেত পরমাণু জগৎ ভরিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রত্যেকেই জাগ্রত জীবন্ত, একি দৃশ্য ! স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, ক্ষণিক পরেই পশ্চাতে পথিকের কলরব শুনিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য আনিয়া খুব বেগে ছুটিলাম, কিন্তু মানুষ দেখিতে বড় ভয় হইতেছে, যেন কোন অজানা মানবীয় স্বভাব ছাড়া দেশের স্বভাব লইয়া এই মর্ত্যলোকে মানুষের দেশে আমি হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা এক প্রহরের সময় পূর্বের হোটেলে আসিলাম। সেখানে আগমনের পর পুস্তকের বস্তা অধ্যক্ষের নিকট হইতে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া লইয়া তীব্র বেগে ছুটিলাম। সেদিন রাস্তায় অবস্থান করিয়া পরদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্বেই গ্রামে আসিলাম।

কিন্তু বাড়ীতে আসিতে নিরতিশয় লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল, তবে আমার পিতৃদেবের সাধু চরিত্রের কথা মনে হওয়াতে আমার সেই ভয় দূরীকৃত হইল। অপরাধীর ন্যায় বাড়ীর প্রাঙ্গনে আর না দাঁড়াইয়া বেগের সহিত ঘরে ঢুকিলাম, মা দু'চার কথা বলিলেন, আর কেহই কিছু কহিল না– আশ্বস্ত হইলাম !

ব্রহ্মজ্ঞান

বিকালে গোপাল সাধুর আখড়ায় যাইয়া সকল বিষয় আলাপ আলোচনা করিলাম, দুই তিন দিন বেশ কাটিয়া গেল। ১৩০৩ সনের শ্রাবণের প্রথম ভাগে একদিন অল্প বেলা থাকিতে একটা বাঁশ হেলান দিয়া শূণ্যপানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, হঠাৎ হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তাহা হইতে ছন্দোবদ্ধ পদ বাহির হইতে লাগিল– আনন্দে বিভোর হইলাম।

নাথ ! তোমা বিনে এ ভব ভবনে
যত কিছু, কিছু নয়,
তুমি মূলাধার সর্ব সারাৎসার
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডময়

এই পদই প্রথম আসিল, তাহার পর ক্রমে সম্পূর্ণ একটি কবিতা হইল, ইহাতে আমি কি যে হইয়া গেলাম তাহা আর বলিতে পারি না। এই আন্দোলনেই রাত্রি এক প্রহর হইল, আহারের পর নিদ্রা গেলাম। প্রাতঃকালে জাগিয়াই আবার ছন্দোবদ্ধ পদ আসিতে লাগিল– পরমানন্দে বিভোর হইলাম, হৃদয় নাচিয়া উঠিল, কারণ সময়ানুযায়ী মনের ভাব প্রাণের আবেগ কবির ভাষায় প্রস্ফুটিত হইলে কি যে এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় মন বিভোর হইয়া যায় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবার কথা নহে।

এইভাবে ক্রমেই কবিতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন নাই, রাত নাই, সময় অসময় নাই, সকল সময়ের জন্য জল বুদ্বুদের ন্যায় নূতন নূতন ভাব জাগিতে লাগিল, আর ভাবানুযায়ী ছন্দোবদ্ধ পদ আসিয়া আমাকে পরমানন্দ লহরীতে লইয়া খেলাইতে লাগিল, প্রায় এক দেড় মাস পর্য্যন্ত মূহুর্তের জন্যও যেন বিরাম পাইলাম না। অবিরাম স্রোত হৃদয়ে ছুটিয়াছে, ক্রমে কিছুটা কমিয়া আসিল। স্বামীজীর নিকট লিখিলাম, তিনি আশ্বাস দিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছি, তাহাতে বাড়ীর লোক একত্র হইয়াও আমাকে থামাইতে পারে নাই বা কিছু উত্তর প্রত্যুত্তর পায় নাই। বড়ই কৌতুহলপূর্ণ অতিশয় আশ্চর্য আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন হইতে লাগিল এবং কখন আনন্দ কখন বা কেন যেন ভীষণ নিরানন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম। তাহাতে একটু পন্থা এইমাত্র হইল যে, প্রাণের ভাবাবেগ ভাষার বাঁধনে প্রকাশ করিয়া ঘোরতর অশান্তিতেও কিছু কিছু শান্তি পাইতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে একদিন ধ্যান করিতে বসিয়াছি হঠাৎ নাভি হইতে 'কট্' শব্দ হইয়া একটি বিদ্যুৎকণার ন্যায় জ্বলিয়া

উঠিল এবং অতুলনীয় আনন্দ ও সাহসে হৃদয় ভরিয়া গেল। ক্রমে ভাদ্র মাস অতীত হইল, আবার আশ্বিনে এদিককার অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত জুটিয়া স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে রওয়ানা হইলাম। পিতৃদেবের অনুমতি চাহিলাম, আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। পূজার কয়েকদিন মহা মহোৎসব, সকল শিষ্যবৃন্দ যার যার সাধ্যমত গুরু পূজার উপকরণ লইয়া উপস্থিত। আনন্দ-ধামে মহান আনন্দের কোলাহলে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, অনেক ধর্মবন্ধুদের সহিত নূতন নূতন পরিচয় হইল, পূর্ব পরিচিত বন্ধুদের সহিতও আবার দেখা হওয়ায় কত কথাই হইল। এইভাবে মাত্র তিনদিন অবস্থান করিয়াই সকলের সঙ্গে চলিয়া আসিতে হইল। মহোৎসবের আনন্দেই সেবার বিভোর হইয়া উৎসাহিত হইলাম।

ক্রমে বাড়ীতে আসিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, মোক্তারী পড়ার দিকে মনের আর মোটেও যোগ নাই, কেবল অভিভাবকের মন যোগাইবার জন্য মাঝে মাঝে কিছু কিছু পড়িয়া থাকি। পড়িতে বসিয়াও কেবল ঐ সকল তত্ত্ব বিষয়িনী চিন্তাই হইতে থাকে, তা ছাড়া দিবা বিভাবরী তো ঐ সকল ভাবের আন্দোলন আছেই, এই সময়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করিবার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু ইচ্ছামত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আবার অতিশয় দুঃখিত হইলাম– অনুতপ্ত হইলাম, ইহাতে কেহ কেহ নিন্দাও করিতে লাগিল।

সহিতে না পারি ঘোর অত্যাচার
ফাটিছে হৃদয় মোর
সচির দরিদ্র অর্থহীন নর
সবে বলে দূর্ দূর্
অর্থবশ বিদ্যা শিখিতে পারিনু
দিবানিশি কেন্দে মরি
ঘৃণার তাচ্ছল্যে দহিছে হৃদয়
কিসে বল প্রাণ ধরি
যদি কার কাছে ভাবিয়ে আপন
পরাণ লুকাতে যাই
কপটতা অসি করিয়ে বাহির
হানে বড় ভয় পাই
মূর্খ মূর্খ বলি দিচ্ছে করতালি
তাহে কত ব্যাঙ্গ করি

তুমি মহাপ্রভু দিতেছ অভয়
তাই মাত্র প্রাণ ধরি
আশ্বাসে তোমার রয়েছি জীবিত
আজিও নিরোগ দেহে
বড় দয়া নাথ হৃদয়ে তোমার
তাই দয়াময় কহে
বাঁচাও এ দীনে করিয়ে সান্ত্বনা
শান্তি সুধা কর দান।
জীবনের তরে নিষ্কাম হৃদয়ে
তব পদে সঁপি প্রাণ।

এই সময়ে গীতা পাঠ করা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিলাম এবং মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া কলিকাতা হইতে পকেট গীতা আনাইলাম। ভয়ানক ঔৎসুক্য, গীতা পাইয়া চার পাঁচ দিন দিবারাত্রি অভেদ, সংস্কৃত শ্লোক তাহার অন্বয় এবং বাঙলা অনুবাদ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলাম ও অভাবনীয় আনন্দে, ভাবে, জ্ঞানে ও প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া নিরতিশয় বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিতান্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞ হইলেও আমার কাছে বেশী জটিল বলিয়া বোধ হইল না, বিশেষতঃ যেন পূর্ব অধীত পুস্তকের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে সাত আট দিনের মধ্যে এক রকম টীকা অন্বয় মূল অনুবাদসহ সমগ্র গীতাখানা মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। যেন প্রাণের কি এক অমূল্য জিনিস পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গীতা-জ্ঞান, গীতা-ধ্যান, গীতা-জপ, গীতা-তপ হইয়া পড়িল। নূতন নূতন প্রশ্ন হৃদয়ে জাগরিত হইয়া আপনা আপনিই মীমাংসা হইতে লাগিল। ক্রমে এত অধিক প্রশ্ন ও উত্তর হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল যে, এক মূহুর্তও যেন বিরাম নাই, ক্রমেই শরীরে জ্যোতিঃ বিকাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইতে আরম্ভ হইল– "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" ইহা অতি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়া অপরিসীম আনন্দে অভিভূত হইলাম।

শীতল ভট্টাচার্যের ভগবতী দর্শন

একদিন দুই প্রহরে ঘরে শুইয়া রহিয়াছি এমন সময় গ্রামস্থ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র শীতল ভট্টাচার্য্য আসিয়া শৈশব বন্ধুতার বশে হঠাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিল, ধরিয়াই মা ! মা ! বলিয়া চিৎকার করিয়া দূরে সরিয়া কম্পিত হইতে লাগিল ও পাগলের ন্যায় চাহিতে লাগিল। মা চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– কিরে ! কি ! কি ! তখন একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাপাইতে হাপাইতে সে বলিতে লাগিল, মনোমোহন দাদাকে আমি জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তিনিও নিষেধ করেন নাই, তাহাতে দেখি মা ভগবতী তাহার দক্ষিণ বাহুর উপর দাঁড়াইয়া খিলখিল হাসিতেছেন, (মা ! মা !) আমার আর সেখানে কিছুমাত্র থাকা সাধ্য হইল না। সেখান হইতে কে যেন আমাকে উঠাইয়া আনিয়া এখানে ফেলিয়া দিয়াছেন। মা ! মা ! ইত্যাদি বলিতে লাগিল, আমি অবাক হইয়া শুনিতেছি ও হাসিতেছি। কিছুক্ষণ পরে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলাম সান্ত্বনা দ্বারা ভয় বিদুরিত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিলাম ও বাড়ীতে পাঠাইলাম, কিন্তু তাহার চমক ভাঙ্গিল না। ইহার দশ বার দিন পূর্ব হইতেই গ্রামস্থ গায়ক অধর নট্ট ও রামদয়াল মালী আমার কাছে আসিতেছিল, ধরনী বাবু গান বাদ্য শিখিবার জন্য তাহাদিগকে বেতনভোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাহারা শান্তি পাইত না, নির্দিষ্ট কর্ম শেষ করিয়া প্রায় সারা দিন-রাত্রি আমার সঙ্গে থাকিতে নিরতিশয় ভালবাসিত ও সর্বদা সঙ্গীতাদি দ্বারা মন প্রফুল্ল রাখিত। ইহাদের সঙ্গে হরিমোহন দে নামক একটি বালকও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকিতে লাগিল, কেবল বাড়ীতে আহার ভিন্ন সারা দিন রাত্রি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে নানাবিধ দেবলীলা ও আমার সম্বন্ধীয় নানা বিষয় দেখিতে লাগিল। তাহাতে সে এত মাতোয়ারা হইল যে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে একদিন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া যৎপরোনাস্তি শাসন করিয়াছিল। তাহাতেও সে ক্ষান্ত হয় নাই, রাত্রিতে দড়ি ছিঁড়িয়া খাল সাঁতরিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। শীতলও মাতোয়ারা হইয়া দিবারাত্রি আসিতে লাগিল, তাহাতে বিদ্যারত্ন মহাশয় নিতান্ত ক্ষুন্নমনা হইয়া পিতৃদেবের নিকট নালিশ করিয়া বলিলেন– আমার একমাত্র পুত্র, তাহাকে মনোমোহন পাগল করিল। পিতৃদেব আমাকে এই কথা বলায় শীতলকে নিতান্ত শাসন করিয়া দূরে সরাইলাম। কিন্তু তাহার হৃদয়ে ভীষণ বেদনা হইল, কবিরাজ তাহা আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইল, তাহাতে বিদ্যারত্ন মহাশয় আবার আসিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম– যদি তাহাকে আমার কাছে আসিতে স্বাধীনতা দেন তবে রোগ আরোগ্য হইবে এবং সে ঘর লইবে। কি করিবেন, অগত্যা তাহাই করিলেন। আবার সে আসিতে লাগিল, দুই তিন দিনের মধ্যেই দয়াময়ের কৃপায় শান্তি লাভ করিয়া ঘর লইল। এদিকে হরিমোহন, রামদয়াল ও অধরকে লইয়া গোপাল সাধুর আখড়াতে সঙ্গীত ও সদালোচনাতে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম, কখন বা গীতা পাঠ করিয়া সমবেত লোককে শোনাইতে লাগিলাম। একদিন আমি আখড়ায় গীতা পাঠ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অর্থ করিতেছি, অন্যদিকে আমার মন নাই, ইত্যবসরে আমার

একটি সহপাঠি– ইংরেজী স্কুলের ছাত্র, আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে ছিল। হঠাৎ হাসি দিয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিল, আমি যেন জড়সড় অসার হইয়া পড়িলাম। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র করিল– মনোমোহন মহাপণ্ডিত হইয়াছে, তিনি গীতা পাঠ করেন ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক বাক্যে যেখানে সেখানে নিন্দা করিতে লাগিল। আমি পূর্ব হইতেই এক রকম গ্রাম্য বন্ধুতা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, গোপাল সাধুর আখড়া ভিন্ন আর কোথাও যাইতাম না। তন্মধ্যে সম্মুখে কেহ পড়িলে দু'চার কথা আলাপ হইত মাত্র, এইসব কথাতে আমার হৃদয় উত্তেজিত এবং দ্বিগুণ বেগে উৎসাহিত হইতে লাগিল, নানা গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ও আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আলোচনার মধ্যে এমন সকল যুক্তি-তর্ক আসিতে লাগিল যে, ভাল ভাল পণ্ডিত তর্কজালে জড়িত হইয়া হার মানিতে লাগিল– তাতে হৃদয়ের বল আরও বাড়িয়া উঠিল। এদিকে স্বপ্নদর্শন, কবিতা লেখা, হৃদয়ে প্রশ্ন ও মীমাংসা, স্বামীজীর আশ্বাস বাক্য, ব্রহ্মভাব বোধ, এই সকল বিষয়ে প্রাণে অমিত বল খেলিতে লাগিল, তখন আর কিছু মাত্রও ভয় নাই। জ্ঞান পূর্ণ ভাবে অভয় দিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে চণ্ডীপাঠের নিরতিশয় স্পৃহা জাগিল। এক ব্রাহ্মণের নিকট উহা চাহিলাম। তাহাতে তিনি বিদ্রূপ করিলেন ও ভয় দেখাইলেন যে, শূদ্র চণ্ডী স্পর্শও করিতে পারে না, পাপ হয় এবং পাগল হয়, মন কিন্তু মানিল না। এই সকল কুসংস্কার অনেকদিন পূর্বেই মন বুঝিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে। কাজেই কলিকাতা হইতে আনাইয়া সম্যক পাঠ করিলাম এবং এত অভ্যস্ত করিলাম যে, পুরোহিত বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের বাড়ীতে কোনও পর্বোপলক্ষে গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতে আসিলে তাঁহাকে পদে পদে ভুল ধরিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে সাধারণ কোনও ব্রাহ্মণ আর আমাদের বাড়ীতে এসব গ্রন্থ পাঠ করিতে সাহস পাইত না ও আসিত না।

ক্রমে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থাদীও কিছু কিছু পাঠ করিলাম। ইতিমধ্যে ছোট ক্ষুড়া মহাশয় কতকগুলি বহি আনাইবার সময় শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীও আনাইলেন, তাহা আমাকে পড়িতে দিলেন উহাতে সুন্দর অদ্বৈত মীমাংসা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। এ যাবত প্রাণের ভিতর যে অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়া আন্দোলন হইতেছে, শংকরের বাক্য তাহার অনুকূলে সমর্থন করিয়াও অনেক সুন্দর সুন্দর সুযুক্তি দেখিয়া দৃঢ়তরভাবে জ্ঞানকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিল। হৃদয় আনন্দ-জ্যোতিতে পূর্ণ হইতে লাগিল এবং বল সঞ্চয় ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল।

'দয়াময়' নামের মহিমা

একদিন আমাদের গাভীর প্রসব হইয়াছে, বাছুর দুগ্ধপান করে না– বাড়ীর কর্তামহাশয়েরা বহুবিধ চেষ্টার পর নিরাশ হইয়া যার যার কাজে চলিয়া গিয়াছেন। ইত্যবসরে নিরালায় আমার মনে এক খেয়াল উঠিল, তাহাতে ঐ বাছুরকে "দয়াময়" নাম শোনাইয়া যেই স্তনের নিকট দিয়াছি অমনি সে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। তাঁহার নামের মহিমায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, ক্রমে সকলেই দেখিয়া অতি আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন।

তখন আবার মোক্তারী আইন পাঠ করিতেছি, পড়িতে বসি সত্য কিন্তু মন মোটেই বসে না, চোখে ভাসে নানা রূপ, হৃদয়ে ভাসে নানা কথা, দুই চার পংক্তি পাঠ করিয়া ঐ আলোচনা নিয়াই নীরবে নীরবে ভাবতরঙ্গে খেলিতে লাগিলাম। বর্ষাকাল– পূজার পূর্বে স্বামীজী এদিকে আসিলেন, সঙ্গে প্রিয় বন্ধু দ্বারকানাথ ও অনেকানেক ভক্তবৃন্দ, কয়েকদিন পরমানন্দে চলিতে লাগিল, নানা উপদেশ নানা ভাব দেখিতে লাগিলাম। যাওয়ার দিন পিতামহাশয়কে বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন,– চণ্ডী ও গীতা পকেটে লইলাম। তিনি নৌকায় উঠিয়াই আমাকে চণ্ডী পাঠ করিতে বলিলেন, অনেকক্ষণ পাঠ করিলাম। পরে যাইয়া আন্দিকুটস্থ বিশ্বম্ভর নাথ নামীয় এক ভক্তের বাড়ীতে পৌঁছিলাম, সেখানে রাত্রিতে থাকা হইল।

দ্বারকাবাবুর সঙ্গে সমাধি অবস্থা লাভ

রাত্রী প্রায় চারি দণ্ড হইয়াছে এমন সময় দ্বারকাবাবু আমাকে ডাকিয়া পার্শ্বের অন্য এক ঘরে নির্জনে লইয়া গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি কলিকাতা কর্তাভজা দলের অধ্যক্ষ জগৎবাবু হইতে শ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা সাধনা করিবার একরকম প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখাইতে লাগিলেন, আমিও তাহার অনুরূপ করিতে লাগিলাম, ইহাতে মন মস্তিষ্কের এমন এক আমোদময় কুঠরীতে যাইয়া হঠাৎ লয় হইল যে, তাহাতে দুই তিন মিনিটকাল অতি পরমানন্দ সমাধি অবস্থাই ভোগ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ স্বামীজী আহ্বান করিলেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম। পরদিন শেষ বেলাতে কালীকচ্ছ অভিমুখে রওয়ানা হইয়া তাহার পরদিন প্রভাতে স্বামীজীর বাড়ীর ঘাটে পহুঁছিলাম; উৎসব আরম্ভ হইল– সকল ধর্মবন্ধুগণ একত্রিত হইলেন। শেষদিন প্রভাতের অল্প পূর্বে আমাকে ও দ্বারকাকে স্বামীজী ডাকিয়া লইলেন– গাছতলাতে বসিলাম। ক্রমে রাত্রি চার দণ্ড হইল– এই বসাতেই রহিলাম, ইহাতে কোনও প্রস্রাব পায়খানার পীড়া কিংবা অন্য কোনও কষ্ট কিছুমাত্র হইল না। এই সময় তিনি সমাগত শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ ও নাম প্রদানে বিদায় করিয়াছিলেন ও আমরা তাহা লিখিয়াছিলাম।

প্লানচেট

পরে আরও চার পাঁচ দিন থাকিয়া প্লানচেট ধরিবার কৌশল জানিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আসিয়া গোপাল সাধুকে সঙ্গে লইয়া ঠিক ঐরকম প্লানচেট তৈয়ার করিলাম ও পরদিন হইতে ধরিতে লাগিলাম। তাহাতে মনের আত্যন্তিক একাগ্রতায় দেবভাবের আবির্ভাব স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল এবং অলৌকিক বাণী, নূতন নূতন কথা ও ভাব পাইতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে নিকটবর্তী স্থানের ধর্মবন্ধুগণও যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং প্রথম সঙ্গীত রচনার অভ্যাস আসিতে লাগিল। আগের দিন প্লানচেট ধরিয়াই সঙ্গীত রচনা হইল–

"এলেন আজ ধরাধামে দয়াময়ী মা জননী
বিলাইতে অমরতা, বাড়াইয়ে যুগল পানি"

এই পদ রচিত হইলে সুর তালে অধর নন্ট গান করিল, তাহাতে মন বড়ই উৎসাহিত হইল। এইভাবে ক্রমেই সঙ্গীত রচনা বাড়িতে লাগিল ও নূতন নূতন ভাব আসিতে লাগিল।

মা মনসার আবির্ভাব

একদিন প্লানচেট ধরিয়া বসিয়া আছি এমন সময় হঠাৎ ঠক্ ঠক্ শব্দ হইয়া লেখা হইল "মনসা" আসিয়াছে, আর অমনি প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোককে উল্লঙ্ঘন করিয়া লাফ দিয়া এক সর্প আসিয়া আমার হাতের কাছে ফণা ধরিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই ভয় পাইল না, পরে আবার আপনা আপনিই একদিকে চলিয়া গেল।

আর একদিন রাত্রিতে পিতৃদেব এবং গ্রামের দুই তিন জন বিধবা মেয়ে নিকটে বসিয়াছে, আমি প্লানচেট ধরিলাম– তাহাতে গঙ্গার আবির্ভাব হইল। ঐ মেয়েরা আমার নাকে নোলক অঙ্গে অলঙ্কার ও সর্বাঙ্গ জ্যোতিষ্মান দেখিতে পাইল, পিতৃদেবও আশ্চর্য্য হইলেন। হাত উঠাইলাম, আমিও যেন শরীরের উপর এক দেব আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। অনেককে আমার হাতে ধরিতে বলিলাম– যাহারা স্পর্শ করিল, তাহাদের সকলেরই হাত বরফ স্পর্শে যেরূপ আড়ষ্ট হয় তদ্রূপ হইতে লাগিল। এই প্রকার বহুবিধ লীলা প্রকাশ হইতে হইতে হৃদয়ে এক পরম আনন্দময় জ্যোতির দর্শন

পাইলাম। কখন কখন শরীরের উপরও নানা রূপ ধরিয়া সেই জ্যোতিঃ ভাসিতে লাগিল, আর অবিরাম নাম জপ হইতে লাগিল হৃদয় মন কবলিত হইয়া গেল, বিষয়ী লোক দেখিতে ভয় হইতে লাগিল। কেবল যে সকল লোক ধর্মপ্রাণ তাহাদের সঙ্গে থাকিতেই শান্তি বোধ হইত। হৃদয়ের মধ্যে কে যেন বসিয়া জটিল তত্ত্ব অবিরাম প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মীমাংসা করিয়া সত্য বুঝাইতে লাগিল। খাইতে, শুইতে, বসিতে হৃদয়ের সেই সকল কথা আর ফুরাইত না। তাহাতে একদিন একটি সঙ্গীত রচনা হইয়াছিল–

"মন আপন স্বভাবে তোমারে ভাবে
অবলম্বন জগতে তুমি মাত্র স্বরবে
চায় না আর কোন দিকে প্রাণচক্ষু অনিমিষে
সে রূপ মাধুরী পানে চেয়ে রহে গরবে"

বাস্তবিক মন যে কে টানিয়া ধরিয়া রাখিত, বাধ্য করিয়া তত্ত্ব মীমাংসা শোনাইতে, তাহাতে ঐ সকল মীমাংসিত তত্ত্ব পুস্তাকারে কিছু লিখিয়া লইলাম। কিন্তু সেই সকল কথা সম্যক লিখা কিছুতেই সাধ্যায়ত্ত হইল না। এইভাবে কবিতা লিখা, গান লিখা, তত্ত্ব লিখা, দেব-দেবী দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়া দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

জগন্ময়ী মাতার কোলে স্তন্য পান

এই সময়ে কালীরূপ প্রায়ই স্বপ্নযোগে দেখা দিতেন। শরীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কোলে লইয়া স্তন্য খাওয়াইতেন, আদেশ দিতেন। কখন কখন বা ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতেন, মাঝে মাঝে অন্য বহুবিধ রূপ দেখা যাইত। কখন প্রাণে শূণ্য বোধ, কখন দূর্বলতা, কখন উদাসীনতা, কখন বীতরাগ, কখন নাস্তিকতা, কখন শিব-ভাব, কখন কালী-ভাব, কখন বা গাঢ় অনুরাগ আসিত, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিতে পারি নাই। এই সমস্ত ভাবের তরঙ্গ যেন কি এক অজানিত পর্যায়ক্রমে জীবনের উপর খেলিয়া আমাকে বিদগ্ধ ও বিভোর করিয়া কবলিত করিতে লাগিল।

তবে যখনই যে ভাব আসিত তাহা সর্বদাই চিঠি পত্রাদি দ্বারা স্বামীজীকে জানাইতাম ও তিনিও তাহার উপদেশ প্রদান এবং সাধনার প্রণালী দেখাইয়া শান্তি দান করিতেন– এমনও হইত যে, কোনও বিষয়ে চিঠিখানা লিখিতে লিখিতেই প্রাণ ভরিয়া শান্তি আসিত। আর স্বামীজীর চিঠি পাইলে যেন অমূল্য অমৃত–মাধুরী হাতে পাইয়াছি বলিয়া মনে করিতাম।

জ্যোতিঃ দর্শন-১৩০৪ বাংলা

এইভাবে দিন যাইতেছে। ১৩০৪ বাংলার মাঘ মাসের রাত্রিতে ঘরে লেপ গায়ে দিয়া চক্ষু মুদিয়া নিদ্রাবেশে নাম জপ করিতেছি, হঠাৎ ইলেকট্রিসিটির ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বল ঘন আলোকে সকল ঘর আলোকিত হইয়া গেল। মনে ভাবিলাম– একি ? এ আলো কোথা হইতে আসিল ? চক্ষু খুলিলাম– তাহাতেও এক রকমই দেখি, বাহিরের দিকে মনশ্চক্ষু নিলাম– বাহিরের সব বস্তু দেখিতে পাইলাম। আবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখি ঘরে সাজান সব বস্তু দেখা যায়– চমকিত হইলাম। লেপখানা মাথার উপর হইতে ফেলিয়া দিলাম, তবুও সেই জ্যোতিঃ– উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, অমনি হঠাৎ লুক্কায়িত হইয়া গাঢ় রজনীর অন্ধকারে সব ডুবিয়া গেল– কত কিছু আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। রজনী প্রভাত হইল, মনে অপরিসীম আনন্দ ক্রমে হাটিতে বসিতে সর্বদাই যেন অনন্ত জড় পদার্থ ভেদ করিয়া এক মহান জ্যোতিই অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি হইতে লাগিল ও দেখিতে লাগিলাম। হৃদয়ে ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণরূপে আভাস দিতে লাগিল, কে যেন দেহ-দেহী এতদুভয়ের ভেদ ঘুচাইয়া এক মহান জ্যোতি অবিরত স্ব প্রকাশ ভাব বুঝাইয়া দেখাইয়া কি এক আনন্দ লহরীতে ভাসাইতে লাগিল।

বিবেকের সাথে সংগ্রাম

ইতিমধ্যে কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিও নিতান্ত প্রবল ভাব ধারণ করিয়া দুষ্কার্য্য করাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল এবং কিছু কিছু আপনা আপনি দু'একটা ঘটনা ঘটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মনকে শক্ত করিয়া বাঁধিলাম, বাঁধ মানে না, জ্ঞানে বুঝাইলাম, বুঝ মানে না, ক্রোধেরও কারণ আসিয়া প্রতিহিংসা বিষে জ্বালাইতে লাগিল। ক্রমে মোহ, লোভ, মদ, মাৎর্সয্য, ঘৃনা লজ্জা, হিংসা সকলেই প্রবলভাবে আবরিয়া ধরিতে লাগিল, ঠিক যেন কি আত্মহারা, মাঝে মাঝে জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা, শুদ্ধিহারা, শক্তিহারা, শক্তি হারার ন্যায় শূন্য, শূন্য মনে শূন্য লইয়া বিষয়ের বিষবৎ জ্বালায় অধীর হইতে লাগিলাম, – কখন একটু একটু শান্তি যেন ক্ষীণ চন্দ্রালোকের ন্যায় আসিয়া উকি ঝুকি দিয়া যেন প্রাণটা রক্ষা করিয়া যাইত। এইভাবে নানা অশান্তিকর দর্শনও আসিয়া বড়ই অভিভূত করিয়া ফেলিল– কোন মতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। সাথের সাথী সে গোপাল দাস, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে সকল বুঝিতে পারিত না, যেহেতু লেখাপড়া অতি যৎসামান্য জানে– বিশেষ কোন জ্ঞান নাই, কাজেই প্রাণের এ মহা আলোড়ন তাহার কাছে বসিয়া একরকম মিটাইতাম।

বাড্ডা গ্রামের বাজারে ফকির দর্শন

চৈত্র– ১৩০৪ বাংলা

ক্রমে চৈত্রমাস শেষ হইতে চলিয়াছে, সংক্রান্তি উপলক্ষে কাপড় খরিদ করিবার জন্য পিতৃদেব আমাকে লইয়া বাড্ডার বাজারে গেলেন। সেখানে চাপীতলা গ্রামের প্রসিদ্ধ পদ্ম পালের কাপড়ের দোকানে আনন্দ পাল নামক জনৈক ধর্মপিপাসু ব্যক্তি কাজ করিত, তাহার সঙ্গে পূর্বে একটু পরিচয় ছিল, কাজেই পিতৃদেবকে লইয়া ঐ দোকানে যাইয়া বসিলাম, তখনও বেশী লোকজন আসে নাই। আমরা বেশ সকালে গিয়াছি, তাই এ কথা সে কথা প্রসঙ্গক্রমে নানা কথা আলাপাদি হইতে লাগিল। পিতৃদেব তামাক খাইতে লাগিলেন, আমি বসিয়া বসিয়া নানা সাধন রহস্য শুনাইতেছি। ক্রমে লোকজন আসিতে লাগিল চৈত্র সংক্রান্তির বাজার বলিয়া কাপড়ের দোকানে ভয়ানক ভিড় হইল। একবারে অতি কষ্টে ঘেষাঘেষি করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। ইত্যবসরে কে যেন আমার পা দু'হাতে ধরিয়া অস্পষ্ট স্বরে কেবল বলিতেছে, – পাইয়াছি, অনেক দিনে পাইলাম, আবার পাইব কি – কানে বাজিল, তখন মন কাপড়ের দিকে ও বাজারের কোলাহলে নিবিষ্ট ছিল। হঠাৎ ঐ রকম ক্ষীণ বিনীত স্বরের আওয়াজ পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম– অমনি চাহিয়া দেখি, নিতান্ত কৃশ, খড়ম পায়ে নেংটী পরিধান অতি দীর্ঘকায় কালবর্ণের একটি যুবক হঠাৎ পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু দৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম, আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিলাম– তুমি কে ? বাড়ী কোথায় ? সে তার স্বভাবতঃ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল– বাড়ী লঙ্কা, আঃ ! অনেকদিনে দেখা পাইলাম, আবার পাইব কি ? এই বলিতে বলিতে দু'পা এক পা করিয়া একটু সরিল। ইত্যবসরে সেখানে বসা সকল লোক চমকিত হইয়া তাহার দিকেই চাহিয়া দেখিতেছিল। যেই দূরে সরিল অমনি তালাস করিয়া বিশেষ পরিচয় নিবার জন্য বাহির হইলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য আর কোথাও পাওয়া গেল না, কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও বলিল না–ঐ দোকানের দর্শকমণ্ডলী অবাক, অনেকানেক কথা হইল, পরে কাপড় লইয়া বাড়ীতে আসিলাম। পিতৃদেব নানাভাবে সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু আমার মানসিক ভাবে একটু উৎসাহ আসিল বই কোনও সন্দেহ হইল না, পরে স্বামীজী বলিলেন– কোনও ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গেল, চিন্তা করিও না। এই কথায় নিশ্চিন্ত হইলাম– চৈত্র সংক্রান্তি কাটিয়া গেল।

গুরুজীর সাথে কথোপকথন
ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি ও নানাবিধ রূপ দর্শন
১৩০৫ বাংলা

পহেলা বৈশাখ বিশেষ এক উৎসব হইবে এই কথা স্বামীজী পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং এই সময়ে সকলকেই উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কাজেই যাইতে বড়ই উৎসুক হইলাম। পিতৃদেবও আমার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া মহাপুরুষের চরণ দর্শন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া আমাকে নিয়া মানিকনগর ষ্টীমারে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। প্রায় প্রহরেক বেলা থাকিতে পিতা-পুত্র দুই জনে তথায় উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের যে কোঠাতে তিনি সর্বদা বসিতেন, সেখানে প্রিয়বাবুকে নিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। বিশেষ বিশেষ অভিপ্রেত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও যাইতে দেন না। আমার পৌঁছান সংবাদ জানাইলাম, তাহাতে আমাকে আগে যাইতে বলিলেন, যাইয়া প্রণাম করিলাম, প্রশ্ন করিলেন–

আকাশে কি এই মুহূর্তে একটা সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হইতে পারে ?

আমি– হ্যাঁ পারে।

স্বামীজী– কি প্রকারে ?

আমি ঐ জ্যোতি দর্শনের কথা ব্যক্ত করিয়া ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছি, অমনি বলিলেন– হ্যাঁ, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

সঙ্গে পদ্য স্তব রচনা করিয়া দু'খানা বই নিয়াছিলাম, পাঠ করিতে বলিলেন– পাঠ করিলাম, তিনি আনন্দিত হইলেন। দেখিলাম শরীরের জ্যোতি শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, – অবতার, অবতার বলিয়া হৃদয়ে বাণী হইল, মন চমকিয়া উঠিল – অমনি সর্বস্ব জীবন শ্রীচরণে ঢালিয়া দিয়া জীবনের পিতা-মাতা, ভ্রাতা, হর্তা– কর্তা বিধাতা গুরুজ্ঞানে জীবনের এই-ই একমাত্র অবলম্বন, বুঝিয়া লইলাম।

ক্রমে পিতৃদেবও সাক্ষাৎ করিলেন দুইদিন চলিয়া গেল। পিতৃদেবকে বিদায় দিলেন আমাকে কিন্তু ছাড়িলেন না, – কতকদিনের জন্য রহিয়া গেলাম।

ইহার মধ্যে সর্বদাই এমন কি দিনের মধ্যে দুই তিন বার আমাকে নির্জ্জনে লইয়া নানাবিধ রূপ দেখাইতে লাগিলেন, হৃদয়ে বল দিতে লাগিলেন। সেই সকল আলৌকিক অপরূপ রূপের ছটা দেখিয়া হৃদয় অপরিসীম তেজে পূর্ণ হইতে লাগিল এবং ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়া বিশুদ্ধানন্দ খেলিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ দত্তের শক্তি লাভ ও দাম্ভিকতা

ইতিমধ্যে আবার প্রিয়নাথ দত্ত হঠাৎ শক্তি প্রাপ্ত হইলেন, দেহে উজ্জ্বল তেজের বিকাশ হইল কিন্তু তিনি শক্তিবলে অহঙ্কৃত হইয়া গুরুদেবকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, বলিলেন– আমি দয়াময় অবতার, স্বামীজী জগৎ গুরু, যেমন স্বামীজী অদ্বৈত আমি চৈতন্য, যেমন স্বামীজী যোহন আমি খৃষ্ট– এই রকম ভাণ আমাদের নিকট করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর আদেশ অনেক সময় উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ও নিজের স্বাধীন শক্তিমত্তা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন আমরা বসিয়া আছি এমন সময় বলিলেন– এখনই স্বামীজীকে দোমহল্লার উপরে আনিব, এই বলিয়া যেই আকর্ষণ করিয়াছেন অমনি স্বামীজী দৌড়িয়া হাজির। আর একদিন আমাকে দিনের বেলায় দু'প্রহরের পর হঠাৎ ঘুম হইতে ডাকিয়া উঠাইয়া বলিলেন– দেখ তামাসা, অমনি শরীর নাড়া দিলেন আর সমগ্র ব্রহ্ম মন্দিরের দালানখানা ঠক্ ঠক্ করিয়া নড়িয়া উঠিল, আমি ভয়ে কম্পিত হইলাম। গোপনে যাইয়া বলিলাম– প্রিয়বাবু বলিতেছেন তিনি অবতার, আপনি জগৎগুরু। আবার নানারকম শক্তি দেখাইতেছেন ও আমাদিগকে বিব্রত করিতেছেন, তাহাতে গুরুদেব বলিলেন– তাহার শক্তি কালবর্ণে রঞ্জিত হউক– বাস্তবিক তাহাই হইল, শরীরের জ্যোতি লাঘব হইল।

গুরুজীর কোলে কিছুকাল

গুরুদেব আমাকে নিয়া প্লানচেট ধরাইলেন ও নিতান্ত ভালবাসা দেখাইলেন, এমনকি একদিন কিছুকাল কোলে নিয়া বসিয়া রহিলেন ও বলিলেন–তোরা আমার বাবা! আমি বলিলাম, বাবা ! বাবা হইতেই তো আসিয়াছি। বড়ই আনন্দিত হইলেন। এইভাবে চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল।

গুরুমার সঙ্গে উপাসনা ও ধ্যানযোগে বীজমন্ত্র প্রাপ্তি

একদিন মাতাঠাকুরাণী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাহাতে প্রিয়বাবু গেলেন না। আমাকে গুরুদেব খুব নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিবার কথা বলিলেন, তাহাতে ধ্যানস্থ হইলাম। তখন আপনা হইতেই যং রং লং বং প্রভৃতি বীজ ফুটিতে লাগিল, উপাসনা শেষে গুরুদেবকে জানাইলাম তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলেন।

গুরুজীর আদেশ পালনে শৈথিল্য হেতু কষ্ট

এদিকে প্রিয়নাথও আমাকে লইয়া বড়ই কৌশল খেলিতে লাগিল, অভিভূত করিতে লাগিল, বাস্তবিক দেখিয়াছি জীবনাবধি আমি যেন স্বভাব শিষ্য। যখন যাহার কাছে গিয়াছি, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে আপনা আপনি তাহাদের নিকট যেন অভিভূত হইয়া শিষ্য হইতে হইয়াছে। এইভাবে যতক্ষণ গুরুজীর নিকট থাকিতাম তাহার ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। প্রিয়বাবুর কাছে আসিলে তাহার ভাবেও কিছু বিভোর হইতাম। এমতাবস্থায় দোদুল্যমান হৃদয়ে প্রিয়নাথের পরামর্শে আমি, গিরীশবাবু ও প্রিয়নাথ ঠিক এক সময়ে রওয়ানা হওয়ার কথা জানাইলাম, তাহাতে গুরুদেব কিছু ক্ষুণ্নমনা হইলেন এবং বলিলেন– দুই এক জন লোক না থাকিলে ভাল লাগে না। মনোমোহনকে আরও কিছুকাল রাখিতে ইচ্ছা ছিল। অবস্থা অতঃপর যা হওক, বলিলেন– এইস যাইয়া, হুকুম পাইয়া ছুটিলাম– আজবপুর আসিয়া ষ্টীমার পাইলাম না। সারাদিন ভুগিয়া অনেক রাত্রের পর অতিকষ্টে ষ্টীমারে চড়িয়া আমি মানিকনগর নামিলাম, প্রিয়নাথ স্বদেশে চলিল। ইহার অনেক পরে ১৩১২ সনে আমি যখন নিতান্ত অসুস্থতা লইয়া কালীকচ্ছ গুরুপাটে যাই তখন আবার প্রিয়নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ– তিনি বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অস্থিচর্ম সার, কিন্তু কি আশ্চর্য তাহাতেও দেখিলাম অহঙ্কার কমে নাই– কদিন পর চলিয়া গেলেন। অতঃপর কি হইয়াছে আর জানিতে পারি নাই।

অলৌকিক দর্শন ও তত্ত্বানুভূতি

বাড়ীতে আসিলাম, সাত আট দিন পর্যন্ত চোখের ঘুম ছাড়ে না দিবা বিভাবরী অবিরাম কেবল ঘুমাইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, – বাস্তবিক ঘুমও নয় যেন মন হৃদয়ে যোগ করিয়া নিঝুম অবিরাম জপ হইতে লাগিল, তাহাতে বিশেষ এক আনন্দানুভব হইত এবং সেই ভাবেই পড়িয়া থাকিতাম। ক্রমে একটু একটু বহির্মুখীন ভাব আসিতে আসিতে প্রকৃতিস্থ হইলাম। অলৌকিক দর্শন, শরীরের উপর জ্যোতি বিকাশ, হৃদয়ে অপরিসীম বল, কখন কখন জ্যোতি দর্শন, চন্দ্র সূর্য্য ও দর্শন হইতে লাগিল ও তীব্রভাবে নূতন নূতন তত্ত্ব ও সঙ্গীত রচনা হইতে লাগিল।

নবীনগর জমিদার বাড়ীতে মহতী সভা

আষাঢ় ১৩০৫ বাংলা

নবীনগর জমিদার বাড়ীর শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবু ইতিপূর্বে শ্রীশ্রী গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তত্ত্ব পিপাসায় ধর্মবন্ধুদিগকে আহ্বান করেন। তাহাতে নিতান্ত বাধ্য হইয়া, পূর্ব কথিত গায়ক রামদয়াল মালী ও হরিমোহনকে লইয়া ২৪শে আষাঢ় তথায় যাওয়া হয়, তিনিও নিতান্ত আপ্যায়িতভাবে গ্রহণ করেন। সেখানে রামদয়াল, গোল মোহাম্মদ, কৃষ্ণ শীল, উদয় সরকার অনেকানেক ধর্মবন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও মহতী সভা হয়। সেই সভাতে আচার্য্যের কর্ম আমাকেই করিতে হইয়াছিল, তাহাতে উপাসনাকালে এরূপ অলৌকিকভাবে প্রার্থনা বাহির হইয়াছিল এবং আমার দেহ হইতে এরূপ জ্যোতি নির্গত হইয়াছিল যে, সভাস্থ সকল লোক অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন এবং বাহির হইতে আকর্ষিত হইয়া দালানের কবাট ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছিল। গোল মোহাম্মদ ইতিপূর্বে গুরুদেবের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্মবন্ধুদের সহিত এক যোগে উপাসনা করিতেছিল সত্য কিন্তু সেইদিনই আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখানে এইভাবে দুইদিন দিবারাত্রি পরমানন্দে কাটিতে লাগিল। একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং আর একজন এন্ট্রান্স স্কুলের মাষ্টার তখন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উপস্থিত হয়। এক ঘণ্টা আলাপের পর তাহারা এত অভিভূত হইল যে, স্নাহানার ভুলিয়া নিষ্পন্দ অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছিল, ক্রমে তৃতীয় দিবসে তথা হইতে বিদায় হইয়া রওয়ানা হইলাম, রাস্তায় দুই তিনটি সঙ্গীত প্রস্তুত হইয়া গেল।

দৈব বাণী

নবীনগর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম – পরমানন্দে দিন কাটিতে লাগিল, হৃদয়ে ভাব ভিন্ন অভাব বেশী কিছু নাই দর্শনের রাজ্য আরও খুলিয়া গেল, হৃদয়ে তত্ত্ব মীমাংসা আরও তীব্র বেগে হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী লইয়া বড়ই বিব্রত হইলাম, দিবানিশি ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান হইল, – ইহার মধ্যে একদিন বেলা এক প্রহরের সময় পদাবলী পুস্তকখানা বুকের নীচে রাখিয়া বিছানায় বালিশ ছাড়াই শুইয়া কেবল নানা চিন্তাতে ব্যাকুল হইতেছি, মন কখন আবিষ্ট হইতেছে হঠাৎ এমন সময় কানের কাছে বজ্র গম্ভীর স্বরে ধ্বনি হইল।

মহাজনের পদ বুঝ্‌লে কি হয় না ভজলে

চমকিয়া উঠিলাম, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম কিন্তু কোথাও কিছু নাই, তাই আবেগ ভরে কত কিছু প্রার্থনা করিলাম, ঐ ধ্বনিকে দৈববাণী বলিয়া বুঝিলাম ও হৃদয়ে শান্তি আসিল।

আর একদিন বেলা দেড় প্রহরের সময় বাহির বাড়ীর কাছারী ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নানা ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময়ে শূণ্য হইতে শব্দ হইল– তোমাদের গুরু আসছে, চমকিত হইলাম কে বলিল !– দেখি কোথাও কিছু নাই, চারিদিকে কেহ নাই প্রকৃতিস্থ হইয়া দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি করিলাম, চেয়ে দেখি আমাদের কুলগুরু তখনও অতি দূরে আসিতেছেন দেখা যায়, দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম।

অন্য একদিন প্রায় ছয় দণ্ড বেলার সময় একটি ছোট বেতের পেটী শিয়রে দিয়া শুইয়া শুইয়া চিন্তা ও জপ করিতেছি হঠাৎ দেখি আমার চারি হাত, চারি পা, চারি চক্ষু, দুই মুখ ইত্যাদি। আবার ক্ষণিক পরেই ঠিক আমার মত এমত রূপ আমার সঙ্গে শুইয়া পড়িল, জড়াইয়া ধরিল, দুজনে সুন্দর আনন্দ করিতে লাগিলাম, আবার ঠিক যেন একজন, আবার ঠিক যেন দুজন, আবার ঠিক একজন হইয়া পড়িলাম। এইরূপ দর্শনলাভে পরমানন্দে মগ্ন হইলাম ও কত কিছু তত্ত্ব হৃদয়ে ভাসিতে লাগিল। এইরকম বহুবিধ দর্শন ও বাণী উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয় মনকে কবলিত করিতে লাগিল। এদিকে মুক্তারী আইন আর মোটেই পড়া হয় না কেবল মাত্র পুস্তক নিয়া বসি বাড়ীর লোকের মন ভুলাইবার জন্য আর কিছুই নহে, ক্রমে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

আপন ভক্তের শিক্ষার জন্য মানুষের মুখেও ঈশ্বর কথা কহেন

অগ্রহায়ন মাস– বাড়ীতে ধান কাটিবার জন্য চৌদ্দ পনের বৎসর বয়স্ক একটি নমঃশুদ্র ছেলেকে চাকর রাখা হইয়াছে, ছেলেটার একটু মোটা বুদ্ধি– গ্রামে ভয়ানক দলাদলি, সাধারণ প্রজাগণ ধরণী পালের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, যদি আপনি ধরণীবাবুর নামে কোনও গয়বুল্লা দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দিয়া তাহাকে অসম্মানী করিতে পারেন তবে আমরা আপনাকে পঁচিশ টাকা দিব, প্রথমে অস্বীকার করিলাম কিন্তু পরে প্রলোভনে পতিত হইয়া স্বীকার করিলাম। পুষ্করিনীর পারে বসিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় এই আন্দোলন হইয়াছিল, নানা কথোপকথনে রাত্রি প্রায় দুই তিন দণ্ড হইল– সমবেত লোকজন চলিয়া গেলে প্রস্তাবিত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাড়ীর দিকে চলিয়াছি তখন ঐ চাকর ছেলেটি একা বাহির বাড়ীর ঘরে টুলের উপর বসিয়া রহিয়াছিল। আমি অনন্যমনা চিন্তা স্রোতে গা ভাসান দিয়া বাহির বাড়ীর ঘরের মধ্যে যেই প্রবেশ করিতে যাইতেছি অমনি চাকর ছোড়াটা টুল হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে বড় আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া উঠিল–

আমার মন গেছে গা ছড়াইয়া ভরাইয়া দিল্লী লাহোর ঢাকার শহর কুচ্ বিহারে সাধন ভজন হবে কিসে

পুনঃ পুনঃ সে লাফাইয়া লাফাইয়া উচ্চৈঃস্বরে অতি বেসুরা আওয়াজে এই গান ধরিয়াছে, দুবার তিনবার শুনিবার পর আর একবার অমনি মনের ভিতর বিষম আন্দোলন আসিল এবং কে যেন বলিয়া উঠিল, বুঝাইয়া দিল, ইহা শুধু তোমারই মন পরিবর্তনের জন্য বলিতেছি। অতিমাত্র অনুতপ্ত হইয়া বাহিরে বসিয়া অমনি ধ্যানস্থ হইলাম এবং দয়াময়ের অলৌকিক লীলা কৌতুহলে প্রাণ মন পরমানন্দ রসে নিমগ্ন হইল। মন আমূল পরিবর্তন হইল। পরদিন প্রাতে ঐ সকল লোকজন আসিলে পরিস্কারভাবে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া নিরস্ত করা হইল।

মোক্তারী পরীক্ষা

ক্রমে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া ফাল্গুন মাসে ঢাকা আনন্দ পালের বাসায় যাইয়া রহিলাম। পরীক্ষার দিন কথা প্রসঙ্গে স্নানাহার করিতে সময় কিছু অতিরিক্ত হইল। তাড়াতাড়ি ছুটিলাম, যাইয়া দেখি ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, প্রায় দশ মিনিট পূর্বে প্রশ্নের কাগজও দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্য মনে সাময়িক কিছু ব্যাথা হইল নতুবা বেশী কষ্ট আসিল না। পরে সাহেব অনুগ্রহ করিয়া নম্বরোক্ত বসিবার জায়গা দেখাইয়া দিয়া প্রশ্নের কাগজ দিলেন, কিছু কিছু লিখিয়া কাগজের শেষে দুই বেলায় দুটি কবিতা রচনা করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিলে লোকে জিজ্ঞাসা করিল– কেমন পরীক্ষা দিলেন মশায় ? আমি বলিলাম,– খুব ভাল লিখিয়াছি, আনন্দময়ের চরণাশ্রয়ে জীবনের লক্ষ্য পরমানন্দ আদর্শের দিকে স্থির হইয়া ছুটিয়াছে। কাজেই তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র নিরানন্দ হইত না। এদিকে ঢাকা হইতে আসিবার কালে একজন মৌলভী সাহেব ও অনেক মুসলমানসহ গয়না নৌকাতে নারায়ণগঞ্জ চড়িলেন– একা হিন্দু আমি, নৌকা ছাড়িল। মৌলভী সাহেব হিন্দুধর্মের অযথা নিন্দাবাজ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাহার সঙ্গে অতি গুরুতর তর্ক আরম্ভ হইল, সেই তর্কে সারারাত্রি অতিবাহিত হইয়া বেলা চারিদণ্ডের সময় মৌলভী সাহেব পরাস্ত হইয়া বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি স্বীকার হই নাই– মৌলভী সাহেব চলিয়া গেলেন।

বৈশাখ ১৩০৬

গেজেট বাহির হইল, ফেল হইয়াছি– অভিভাবকগণ সকলেই নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, আমিও কিন্তু এক বিভ্রাটে পড়িলাম– পরীক্ষা গেল, এখন জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত কি করিব, শেষে সাব্যস্থ করিলাম– কোনও জমিদারের সেরেস্তায় কাজ লইব। দ্বিতীয়তঃ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতো হবেই– পাঁচ সাত দশ দিন নানা ভাবনার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম, ক্রমে দুই তিন মাসই কাটিয়া গেল।

পাঠ্যাবস্থার গ্রাম্য বন্ধুগণ বিদেশবাসী, এমতাবস্থায় রমনকৃষ্ণ পালের পুত্র নরেন্দ্র পাল নামীয় একটি ছেলে কতক দিন শহরে বন্দরে ঘুরিয়া বেশ বাবু হইয়া পড়িল। সে যদিও আমা হইতে কিছু কম বয়স্ক কিন্তু তাহাতেও সদা সর্বদা আসা যাওয়াতে যথেষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। এ জীবনে কাহারও সঙ্গে বন্ধুতা না করিলেও তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত হইয়া গুরুদেবের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন– সে একটা অকাল কুষাণ্ড, তাহার সঙ্গে বন্ধুতাতে হৃদয়ে

নরকের ভাবই আসিবে। এই অনুজ্ঞাতে অতি আশ্চর্য্য হইলাম এবং ক্রমেই আত্মীয়তা কমাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে তাহার নিকট হইতে কয়েকখানা বহি আনিয়া আমি পাঠ করিয়াছিলাম এবং সেও আমার নিকট হইতে পুস্তক নিয়া পাঠ করিত। আমার একখানা বড় বহি নিয়া সে হারাইল, বন্ধুতার খাতিরে বেশী কিছু বলা হইল না। ইতিমধ্যে ছোট খুড়ামহাশয় শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণ জীবনী, কমলে-কামিনী প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক কলিকাতা হইতে আনাইলেন, এবং নিজে কিছু কিছু পাঠ করিয়াই আমাকে দিলেন, বুঝিলাম যেন আমার জন্যই দয়াময় তাঁহাকে দিয়া এই সকল আবশ্যকীয় গ্রন্থ আনাইয়াছেন, অতি আদরের সহিত পাঠ করিলাম। পুস্তকগুলি আমার কাছেই রহিল, ইত্যবসরে গ্রামস্থ ধরণী পালের এক আত্মীয় বেড়াইতে আসিয়া আমার নিকট হইতে কয়েকখানা পুস্তক নিলেন, তাহার মধ্যে কমলে-কামিণী বা শ্রীমন্তের মশান নামীয় গিরীশ বাবুর নাটকখানাও নিল। কতকদিন পর তাহাদের আত্মীয় চলিয়া গেল। পুস্তকগুলো বিধুবাবুর নিকট আমি চাহিলাম, তাহাতে তিনি কমলে-কামিণী ভিন্ন অন্য বহিগুলো দিলেন এবং কমলে-কামিণীখানা দেখাইয়া বলিলেন এখানা আমাদের। প্রথম পৃষ্টার উপরে দেখি ইংরেজীতে ধরণী ধর পালের নাম লেখা। আমি অতিমাত্র অবাক হইলাম। সেখানে আর একটি আমার স্কুলের সহপাঠীও ছিল, তাহার উপস্থিতিতেই বলিলাম, বিধুবাবু, আপনি বলেন কি ? পুস্তকখানা তো আমার।

বিধুবাবু বলিলেন– না, এখানা আমাদের, তুমি কিছু পূর্বে নরেন্দ্র হইতে যে কমলে-কামিনী পড়িতে নিয়াছিলে তাহা দেও নাই– এখনে পাইয়াছি। আমি বাস্তবিক চার পাঁচ মাস পূর্বে নরেন্দ্র হইতে আনিয়া ফণীভূষন পাল নাম ইংরেজীতে দস্তখত করা একখানা কমলে-কামিনী আনিয়া পড়িয়া আমার কাছে বিশেষ ভাল না লাগাতে দুই এক দিনের মধ্যেই তাহাকে ফেরৎ দেই, এই কথার সত্যতার জন্য নরেন্দ্রকে ডাকাইলাম। সে আসিয়া স্পষ্ট বলিল যে না, তুমি বহি দেও নাই, এই পুস্তকখানাই সেখানা। আমি অতিমাত্র অপ্রস্তুত হইয়া নানাবিধ প্রমাণ সত্ত্বেও হার মানিয়া লজ্জিত হইলাম। প্রাণে বড় আঘাত লাগিল এবং সেই হইতে আন্তরিকতা ছুটিয়া মৌখিক ভালবাসা রহিল মাত্র এবং বুঝিলাম যে সত্যই মহাপুরুষের বাক্য সফল হইল। মনে আসিল –

"সন্ন্যাসী তো চোর নয় দ্রব্যে সে ঘটায়।"

তাহার দুই তিন বৎসর পর নরেন্দ্র প্লীহা রোগে মারা গিয়াছে।

গুরুজী কর্তৃক শক্তি সঞ্চার
আশ্বিন মাস ১৩০৬ বাংলা

ক্রমে আশ্বিন মাস আসিল, কালীকচ্ছে প্রতি সনই এই সময়ে ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া মহামহোৎসব করিত, কাজেই এই সময়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়া আরও কয়েকজনের সঙ্গে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। উৎসব আরম্ভ হইল, পরমানন্দে তিন চার দিন কাটিয়া গেল, রাত্রিতে রওয়ানা হইবার কথা হইল, গুরুদেব কাছে ডাকিয়া লইলেন, তখন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড হইয়াছে, নিকটে বসিলাম। আমার বাম হাতখানা টান দিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। বলিলেন– কি দেখ ? চেয়ে দেখি গুরুদেবের সর্বাঙ্গ ও আমার সর্বাঙ্গ একেবারে শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে ! আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম– বাবা ! আপনার ও আমার শরীর শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমনি প্রেমভরে হাতখানাতে ঝাকি দিয়া বলিলেন– যাও বৎস পাশ হইয়াছ, আইস গিয়া– কোনও ভয় নাই। সতৃষ্ণ নয়নে কিছুকাল সেই মনোমোহনের মনোমোহন রূপের দিকে তাকাইয়া শ্রীচরণধূলি গ্রহণ করিয়া রওয়ানা হইলাম। কিন্তু হায় ! এই দেখাই আমার জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শেষ দেখা হইল আগে বুঝিতে পারি নাই, তাহলে কি আর শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িয়া এই কোলাহলপূর্ণ সংসারের অশান্তি কূপে নিমগ্ন হই,– গুরু, গুরু ! বাবা ! বাবা ! তোমার অপরিসীম করুণা আমার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া রহিয়াছে– তুমিময় জীবন কর–

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।

বাড়ীতে আসিলাম, মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চারে মন প্রাণ আনন্দে বিভোর, এমন কোন জটিল তত্ত্ব নাই যাহা হৃদয়ে মীমাংসিত না হয়। ব্রহ্মভাবে হৃদয় বিগলিত, শরীরের উপর জ্যোতি খেলিতে লাগিল,– কয়েকদিন অতি পরমানন্দে কাটাইলাম।

উদাসীনতাই– অনুশোচনার কারণ

ইতিমধ্যে গ্রামে নাটকের বড় ধূমধাম পড়িয়া গেল। সকলের সঙ্গে বাধ্য হইয়াই যোগ দিতে হইল, বড় মাতিয়া গেলাম। পৌষ মাঘ মাসে কালীকচ্ছে মহামহোৎসব হইল। অনেক অলৌকিক ব্যাপার ও সাধনার অনেক তত্ত্ব গুরুদেব শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিয়া প্রদান করিলেন ও আমাকে চিঠি দিলেন। সকলের নিকট আমার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মূর্খ আমি, সামান্য নাটকের খেয়ালে পড়িয়া সেই সময়ে সাক্ষাৎ করিলাম না, মনে ভাবিলাম হয়ত– এক সময় করিব।

গুরুজীর নিকট চিঠি ও প্রত্যুত্তর
চৈত্রমাস ১৩০৬ বাংলা

ইহার পর উৎসব শেষ হইল। উৎসবের কাহিনী অন্যান্য ভক্ত বৃন্দের নিকট শুনিলাম, মনে বড় আঘাত লাগিল। চৈত্র মাসের দুই তারিখে গুরুদেবের নিকট চিঠি লিখিলাম।

অপ্রকাশ হও স্বপ্রকাশ
এ রহস্য করহ প্রকাশ
অন্ধকারে কত রব আর
অবতার; খুলে দাও ভবিষ্যৎ দ্বার
দেখি বুঝি করি, হরি করাইতে
চাই যে প্রকার।

ছয় তারিখ তাঁহার উত্তর আসিল, লিখিয়াছেন –

ঢাকা নাই খোলা বটে আকাশের প্রায়
দুই মাসে পরিষ্কার হবে দেখা যায়
আসন বসন ছাড়ি সাধিবারে কাজ
বিবাসা হলেন দয়াময় ! নাহি লাজ
ছদ্ম ভাব আজও কিছু আছে দেখা যায়
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হওক, হল দাও সায়।

পাঠ করিয়া তখন যাহা বুঝিবার তাহাই বুঝিলাম। মনে করিলাম হয়তঃ দুই মাস পর বিশেষ ভাবে দয়াময়ের কার্য্য প্রকাশ হইবে। কিন্তু কে জানিত যে এই সময়ে তিনি অপ্রকট হইবেন, তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানিতেন। ইহার দুই বৎসর পূর্বেও একদিন এক ভক্ত বলিলেন– বাবা ! আমি দেখিলাম– আপনি নাকি আর দুই বৎসর থাকিবেন। তিনি বলিলেন– হ্যাঁ, তবে কোথাও যাইব না, অতি নিরালায় থাকিবমাত্র তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে পাইবে– সকলে দেখিতে পাইবে না, ইত্যাদি মন ভুলান কথায় আমাদিগকে ভুলাইতেন এবং উপদেশ ও সান্ত্বনা দিতেন।

উপনিষদ প্রাপ্তি
১৩০৭ বাংলা

বৈশাখ মাসে কোনও বিবাহোপলক্ষে দাউদপুর পত্তন রওয়ানা হইলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাইয়া এক দোকান ঘরে বসিয়াছি, অল্প পূর্বে কিছু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনও ঘরের চাল হইতে টুপ টাপ বৃষ্টি বিন্দু পতিত হইতেছে, আমি নীচের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি– দেখি দেড় অঙ্গুলী পরিমিত একটি হরিদ্রাবর্ণ কাগজ, বৃষ্টি ফোটা পতিত হইয়া নড়িতেছে, হাতে উঠাইয়া লইলাম-চাহিয়া দেখি তাহাতে লেখা– দশোপনিষদ;– কলিকাতা প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রীর নিকট পাওয়া যায়, মূল্য দশ আনা। ইতিপূর্বে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম– ধর্মের সার তত্ত্ব আমাদের কোনও তত্ত্ব গ্রন্থে আছে কিনা। তিনি বলিয়া ছিলেন– কঠোপনিষদে আছে, সেই হইতে মনে মনে তালাশ করিয়া আসিতেছিলাম। এক্ষনে ঐ কাগজখানাতে দশোপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদেরও নাম পাইয়া বড়ই আনন্দের সহিত কাগজখানাকে পকেটে পুরিলাম ও গন্তব্যস্থানে রওয়ানা হইলাম। তথায় যাইয়া দেখি যে, অলকার বিবাহ সেই তারিখে হইবে না, কাজেই মনে হইল কালীকচ্ছ যাইব। কিন্তু সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনে বিবেকের আদেশ বুঝিতে না পারিয়া বাড়ী অভিমুখেই ফিরিলাম ও উপনিষদ আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম।

গুরুজী ও গুরুমার অন্তর্ধান

জ্যৈষ্ঠ মাসে গুরুদেব চিঠি দিলেন তুমি সত্তর আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়, আমি হয়ত শীঘ্রই সপরিবারে চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শন করিয়া চট্টগ্রাম যাইব। কিন্তু তখনও আমার যাওয়া হইল না। তিনি চট্টগ্রাম হইতে ফিরিলেন, সঙ্গীয় সকলেই জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন, গুরুদেব একটু অধীর হইলেন। যাহা কিছু কাগজপত্র ছিল তাহা মহেন্দ্র বাবুকে (গুরুদেবের একমাত্র পুত্র) ডাকিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন আমার আর ভাল লাগে না, তুমি এইগুলা নেও। এই কথার পর দুই তিন দিন চলিয়া গিয়াছে, তালুবাবুর (মহেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পুত্র) বড় শক্ত জ্বর। মহেন্দ্র বাবু যাইয়া বলিলেন– বাবা! তালুও বুঝি বাঁচিবে না। অমনি গুরুদেব চকিতের ন্যায় উঠিয়া তালুবাবুর বিছানায় যাইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ধ্যান করিলেন, তালুবাবু আরোগ্য হইলেন। গুরুদেবের কিছু অসুস্থতা প্রকাশ হইল, ক্রমে একটু বাড়িয়া উঠিল, সকলেই ভারী চিন্তিত, যেহেতু এই সুদীর্ঘ জীবনে মহাপুরুষের কখনও কোন অসুখ ঘটে নাই। তাহার পরদিন সকাল বেলায় সকল পরিবেষ্টিত হইয়া শুইয়া আছেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা বলিলেন–

বাবা ! একি অবস্থা, বলিলেন– এই রকমই আবশ্যক। তিনির কন্যা বলিলেন– ঔষধ খান, গুরুদেব উত্তর করিলেন– তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তখন মাতাঠাকুরাণী অধীর হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বলিলেন– এইস, আমার সঙ্গে শয়ন কর। তিনি শুইলেন, শরীরে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন– আমি আগে যাইতেছি তুমি চব্বিশ ঘন্টা পরে আইস। এই বলিয়া শক্তি হরণ করিলেন, মাত্র চৈতন্য রহিল। সমবেত লোককে বলিলেন ধ্যান কর, "অনন্ত সিদ্ধি জয় দয়াময়"– "শেষ যোগ জয় দয়াময়"। সকলে নিমিলিত নেত্রে ধ্যানস্থ আছেন, এই অবসরে মহাপুরুষ মহাসমাধি গ্রহণ করিলেন– ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ বাংলা।

ধ্যানের পর সকলে দেখেন যে, মহাপুরুষ মহাসমাধি নিয়াছেন, কোলাহল পড়িয়া গেল। প্রায় দুই তিন হাজার লোক জমা হইয়া উচ্চৈস্বরে কীর্তনারম্ভ করিল। বেলা অপরাহ্ন, তখনও মহাপুরুষের দেহে জলন্ত জ্যোতি বর্তমান। তাহার পর সকলের মত লইয়া পূর্ব কথিত বৃক্ষতলায় সমাধি করিলেন। চব্বিশ ঘন্টা পরে মাতাঠাকুরাণীও চলিয়া গেলেন, সেখানে তাঁহারও সমাধি হইল।

ঠিক ঐ সময়ে আমি বাড়ীতে নিদ্রিত ছিলাম।

দেখিতে পাইলাম শূন্য মার্গে জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া গুরুদেব চলিয়া যাইতেছেন, বলিলাম– বাবা ! কোথায় যান ! বলিলেন আমি অনন্ত ধামে চলিয়াছি। তাহার পরের দিনের পরের দিন দুই প্রহরের সময় আহারের পর বসিয়া আছি, এমন সময় মা ঘাটে বাসন ধুইতে গিয়াছিলেন, সেখানে এক পথিক মহাপুরুষের মহাসমাধির বিবরণ বলিয়া গেল। মা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জানাইলেন ; প্রথম বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু ক্ষণ পরেই হৃদয় অবসন্ন হইয়া মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৌড়িলাম গোপাল সাধুর আখড়ায়, সেখানে যাইয়া সংবাদ জানাইলাম, সেও অবলম্বন হারা হইয়া আত্মহারা হইল। তখন সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য শ্যামগ্রাম রওয়ানা হইলাম, যেহেতু পঞ্চানন্দ নমঃশূদ্র সেখানে হইতে এই ঘটনার পর বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া শুনিলাম। শ্যামগ্রাম যাইয়া আনুপূর্বিক ঘটনা অবগত হইলাম। প্রায়ই নাকি গুরুদেব আমার কথা বলিতেন ও আমি না যাওয়াতে বড়ই বিমর্ষ হইতেন। এই সকল কথাতে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। আবার দৌড়িয়া বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় গাছতলাতে উপাসনায় বসিয়া কত কান্দিলাম, প্রাণ আর কিছুতেই শান্ত হয় না, বাড়ীস্থ সকলেই নিতান্ত ম্রিয়মান, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। হায় ! এতদিন যে আশা, উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া চলিয়াছি কালক্রমে তাহাও পূর্ণ না হইতেই আশা বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কর্তার রচিত ঐ পদ গাইলাম।

"যে বৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাবার আশে
পত্রচ্ছেদি রৌদ্র লাগে আপন কর্মদোষে।"

স্বপ্নযোগে গুরুজীর বাণী প্রাপ্তি

গুরুজী ও গুরুমায়ের অন্তঃর্ধানে মন আর স্থির হয় না– বড়ই অধীর হইলাম, অমনি ঐ দিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া বলিলেন–

তোমার জীবন আমি সংশোধন করিব

আশ্বস্ত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, ক্ষোভ দুঃখ এক রকম নিবারিত হইল। প্রাতে গোপাল সাধুর আখড়ায় রওয়ানা হইয়াছি অমনি কে যেন আমার হৃদয় হইতে বলিতেছে, আমি গাইতে লাগিলাম–

কোথাও যাই নাই আমি তোদের ছেড়ে,
আমি হারা হয়ে কভু তোরা আমায় ভুলিস নারে।
দূরে নহে কাছে আছি সদায় পাছে,
সমাধি লয়েছি আমি তোমাদেরই হৃদ্‌মাঝারে।
জগত জন তারিতে এসেছিনু অবনীতে,
তাই দিয়েছি নাম সুধা অবিরত মুক্ত করে।
নাম যেখানে আমি তথা নামের সনে আছি গাঁথা,
ডাক্‌বি যখন দেখ্‌বি তখন অভয় দিব অন্তরে।
আমি আলো তোরা ছায়া তোদের সঙ্গে এক কায়া,
আড়াল থেকে ভাবছি বসে নিয়ত মঙ্গল তরে।
আশা পেয়ে অনুক্ষণ, কহিছে মনোমোহন,
বিরহ মিলনে লয় হলে যাবে সত্বরে।

এই সকল বাণী পাইয়া মন আরও সুস্থির হইল। আরও কোথাও কোথাও লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। বাস্তবিক এই সঙ্গীতস্বরূপ বাণীতে যেন সকলের শোক সন্তপ্ত নিরাশা প্রাণে মৃতসঞ্জীবন রস ঢালিয়া দিয়া উৎসাহিত করিয়া উঠাইল। ক্রমে কালীকচ্ছেও সে গান গেল এবং মহেন্দ্রবাবু নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন ও প্রত্যহ গীত হইতে লাগিল।

অন্তর্ধান উৎসবের জন্য গুরুদেবের শিষ্যদের মহেন্দ্রবাবু সমাদরে আহ্বান করিলেন। সকলেই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে তথায় রওয়ানা হইল– আমিও সঙ্গে সঙ্গে জীবন্মৃতের ন্যায় চলিলাম, মনে ভাবিলাম হায় ! এতকাল আমি যাই নাই, এখন যাইয়া সেই শূন্য মন্দির কেমন করিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইব ইত্যাদি কত আন্দোলন মনের মধ্যে লইয়া রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোটেলে যাইয়া রহিলাম, মনে করিলাম– যাহা হ'ক সমবেত ধর্মবন্ধুদিগকে দেখিয়াই মনের জ্বালা কিছু মিটাইব।

আহারের পর হোটেলের মাচায় শুইয়া রহিয়াছি– নিদ্রা হইতেছে না চাহিয়া দেখি একটি পরিচিতের ন্যায় লোক যেন দূরে তামাক সাজিতেছে। সে আমার দিকে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, ক্ষণিক পরেই জানিলাম সে ধর্মবন্ধু চৌদ্দগ্রাম নিবাসী গিরীশবাবুর শিষ্য। তাহাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলিল গিরীশবাবুও পার্শ্বের মাচাতেই শয়ান, চমকিত হইয়া উঠিলাম। তিনি জাগরিত হইলেন, দু'জনে প্রমালিঙ্গনে আনন্দিত হইয়া কথোপকথনে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। পরের দিন প্রাতে রওয়ানা হইয়া কালীকচ্ছ পহুছিলাম। বাড়ীর কাছে যাইয়া প্রাণ দূর দূর কাঁপিতে লাগিল, অধীর মনে আত্মহারার ন্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ঢুকিলাম। শূন্য শূন্য প্রাণে শূন্যের মধ্যে প্রাণের ছবি বুকে লইয়া কোনমতে শান্তি আনিয়া স্থির রহিলাম। দুই তিন দিন কাটিয়া গেল, শেষ দিন ভাবাবেশে অধীর হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম। মহেন্দ্রবাবু বড়ই আর্তনাদ করিলেন ও পরে সমবেত সকলের সঙ্গলাভে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তথা হইতে বিদায় হইলাম। বাড়ীতে আসিলাম।

দয়াময় অবতার
জীবনে দাও সার

আমরা স্বামীজীকে অবতার বলিয়াই জানিয়াছি, দেখিয়াছি ও প্রাণের ভিতর বসাইয়াছি। সর্বধর্ম সমন্বয় যোগে জগতে সত্য প্রচার করিতে তিনি আসিয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা সমন্ধীয় আবহমান কাল প্রচলিত জটিল প্রশ্নজালের মীমাংসা করিয়া আপামর সাধারণে অপত্য নির্বিশেষে সত্য উপলব্ধি করাইয়া তত্ত্ব দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য ছিল এবং তদানুসঙ্গীক অতি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তদবোধক 'প্রকৃততত্ত্ব' নামক মহাগ্রন্থ লিখিয়া জগৎকে উপহার দিয়াছেন।

মহাপুরুষের জীবন- চরিত লিখা আমার মত ব্যক্তির কিছুতেই সাধ্যায়ত্ব নহে। প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে অলৌকিক ঘটনায়, অহেতুকী প্রেমে পরিপূর্ণ জীবনকাহিনী ব্যক্ত করা কীদৃশ ব্যক্তির আবশ্যক তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তবে যদি কেহ এমত শক্তি লইয়া আসেন কি আসিয়া থাকেন, তিনি যদি মহাপুরুষকে বুঝেন এবং তাঁহার অহেতুকী কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আদিষ্ট হন, তবে যদি সেই বিস্তীর্ণ জীবন-চরিত জনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া জগতের ভ্রম-বিশ্বাস দূরে অপনীত হয় ও বিস্ময়ান্বিত করে।

এতবড় মহাপুরুষের জীবন সম্বন্ধীয় কথা পাঁচ কথায় রামায়ণের ন্যায় মোটামুটি কিছু লিখাও নিষ্কলঙ্ক সুদীর্ঘ জীবন-চরিত রূপদর্পনে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়া মলিন করা ছাড়া

আর কিছুই নহে। তবে বিশেষতঃ আমার সহিত পাঁচ সাত বারে অতি অল্প অল্প সময় মাত্র সাক্ষাৎ, তাহাতে কেমন করিয়া সমগ্র কাহিনী জানিতে পারিব। জানিতে বিশেষ কোন চেষ্টাও করা হয় নাই, কারণ ইহা আমার মত লোকের উপযুক্ত নয় বলিয়া মনে করি। আবার এই জীবনের সহিত যতদূর সম্বন্ধ বিধান হইয়াছে তাহাতে আবার যে দু'চারটি কথা শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি, তাহা না লিখিলেও প্রাণের তৃপ্তি হয় না তাই লিখিতেছি।

যখন দ্বিতীয়বার শ্রীচরণ সমীপে যাই তখন একদিন অনেক রাত্রির পর আমি, দ্বারকা, প্রিয়বাবু সকলেই বসিয়াছি, এমন সময় জীবন চরিত্র জানিতে প্রশ্ন করিলাম– তাহাতে প্রথমেই তিনি অতি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গুটী কয়েক কথা বলিলেন, তাহাও সম্যক স্মরণ হইতেছে না। তবে যাহা হইতেছে তাহা এই–

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী

স্বামীজীর পিতা স্বনামখ্যাত রামদুলাল মুন্সীর যখন ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর বয়স তখন তিনি একদিন এক ঘরের প্রকোষ্ঠে নীরবে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাহার পিতামহ এবং গ্রামস্থ অন্য একজন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ বন্ধু অন্য প্রকোষ্ঠে আলাপ করিতেছেন।

পিতামহ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন– আপনি আর কতদিন আছেন।

ব্রাহ্মণ– আমি আরও তিন বৎসর আছি।

পিতামহ– আমি আর একুশ দিন আছি। ইত্যাদি কথোপকথন শেষ হইলে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। রামদুলাল পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– বাবা ! আপনি কি বলিলেন ? তখন পিতামহ জানিতে পারেন নাই যে, রামদুলাল সে সকল কথা শুনিয়াছেন। এক্ষণে জানিতে পারিয়া নানা কথার দ্বারা তাঁহার মন পরিবর্তন করিলেন ও কয়েকদিন পরেই কলিকাতা রওয়ানা হইয়া গেলেন। সেখানে গঙ্গাতীরে নির্দ্দিষ্ট কথিত তারিখে দেহত্যাগ করেন। রামদুলাল মুন্সী পিতৃবিয়োগের পর নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া পড়েন ও পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি শাক্ত ছিলেন, প্রত্যহ কুমিল্লা রাজ-রাজ্যেশ্বরীর বাড়ীতে বিনাসূতে রঙ্গিন ফুলের একটি মালা নিজ হাতে গাঁথিয়া মাকে দিতেন ও প্রত্যহ পূজার সময় একটি করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া মাকে ভাব বিগলিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতেন। রামদুলালী মালসী আপামর সাধারণ ব্যক্তির নিকটই পরিচিত, বিশেষত ঃ–

"জানি মা জানি মা তারা
তুমি জান ভোজের বাজী
যেভাবে যে তোমায় ডাকে
তাতে তুমি হও মা রাজী"

এই ব্রহ্মভাবোদ্দিপক সঙ্গীতটি দেশে বিদেশে সকলেই গাহিয়া থাকেন। কখনও তিনি পূজা সন্ধ্যা না করিয়া কোনও অন্য কর্ম করিতেন না এবং তৎকালে অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে নিতান্ত সম্মান ও ভয় করিতেন। তাঁহার গুরু দক্ষিণা আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তিনি রাজবাড়ীতে চাকরী প্রাপ্ত হইয়া অনেক অর্থব্যয়ে একটি পাকা বাড়ী প্রস্তুত করেন, তাহাতে একদিন তাঁহার গুরুদেব আসিয়া বলিলেন যে, রামদুলাল তোমার বাড়ীখানা বড়ই সুন্দর হইয়াছে– এ কথাতে মুন্সী এক গাড়ু জল ও তুলসীপত্র আনিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং বাজার হইতে দু'খানা নূতন বস্ত্র আনিয়া ধর্মপত্নীকে আহ্বান করিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন– তোমার সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বামহাতে মাত্র সূত্র বন্ধন কর এবং নূতন বস্ত্র পরিধান কর। তিনিও পরিধানের বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া অমনি ঠাকুরকে বলিলেন– দেব, গ্রহণ করুন, তুলসী ধরুন। ঠাকুর তো অবাক এবং অন্যান্য সকলই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কিন্তু রামদুলাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তিনি গুরুদেবকে বলিলেন– প্রভু ! এ জীবন তোমার শ্রীপদে উৎসর্গিত, ইহা দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত তাহা তোমার, যাহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ কর তাহাই মাত্র আমার জীবনের ভোগ্য। দেব ! তোমার চোখে সুন্দর লাগিয়াছে, আজ আমার শুভদিন। গ্রহণ কর– বিলম্বের আবশ্যক নাই। এই বলিয়া অমনি সর্বস্ব গুরুপদে দক্ষিণা দিয়া স্বামীজীর বর্তমার বাড়ীর জমিনের উপর বাচাই উঠাইয়া বাস করিলেন। আগরতলার মহারাজ এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টের সহিত দেওয়ানজীকে পুরস্কৃত করিলেন। আবার এই বাড়ী তৈয়ার হইল। এই বাড়ীতেও একদিন তিনি রাজধানী (আগরতলা) হইতে একটি রূপার হুক্কা ও একখানা বহু মূল্যবান শাল আনিয়া বৈঠকখানা ঘরে রাখিলেন। পরের দিন গুরুদেব সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হুক্কাদ্বারা তামাক দেওয়া হইল, তাহাতে ঠাকুর বলিলেন– এই হুক্কাটি বড় সুন্দর, অমনি মুন্সী বলিলেন– প্রভু ! আপনারই, আপনার জন্যই আনা হইয়াছে। এই বলিয়া শালখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন– সেখানে নাই। ইতিপূর্বে ঠাকুর আসিতেছেন দেখিয়াই, তাঁহার শ্বশুর বাটীর দাসী পাছে শালখানা ব্রাহ্মণে লইয়া যায়, ভাবিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তিনি শালখানা এ ঘরে না দেখিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– শালখানা কোথায় ? তখন ঐ চাকরানী আপনার চতুরতাজনিত প্রশংসা নিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন যে, ঐ ঠাকুর পাছে শালখানা লইয়া যায় তজ্জন্য তিনি আসিতেছেন দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে শালখানা আনিয়া আমি ঘরে উঠাইয়া রাখিয়াছি। যেই এই কথা বলা অমনি আরক্ত নয়নে মুন্সী বলিলেন– তুমি আমার গুরুসেবার বাধক, অতএব ইহজীবনে আর তোমার মুখাবলোকন

করিব না। সত্য-প্রতিজ্ঞ সাধক প্রবরের এই বাক্য শুনিয়া স্ত্রী আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ফিরিলেন না বরং আরও বলিলেন– তবে যাউক এই চাকরানী আমার গুরুদেবের বাটীতে যাইয়া কর্ম করুক, জীবনাবধি তাহার খোরাক ও পোষাক আমি দিব। এই কথার পর অগত্যা তাহাই স্থির হইল এবং শাল ও চাকরানীকে একসঙ্গে গুরুপদে সমর্পণ করিয়া তবে মুন্সী প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এইরূপ আরও ভুরি ভুরি বদান্যতার ইতিহাস এই মহাপুরুষের জীবনে রহিয়াছে। স্বামীজীই তাঁহার একমাত্র সন্তান, আর কোনও সন্তানই জন্মে নাই। স্বামীজীর যখন তের চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন বিবাহ দেন ও উপযুক্ত মাষ্টার রাখিয়া আরবী, পারসী, হিন্দি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ও সঙ্গীত বিদ্যাতে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেন। এমন কি তৎকালে এরূপ সঙ্গীত বিশারদ ও এত অধিক ভাষাভিজ্ঞ লোক এই জিলায় আর কেহই ছিলেন না। মুন্সী রামদুলাল অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও বদান্যতা গুণে বেশী কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবল বলিতেন যে, মা বলিয়াছেন– আমার আনন্দকে কোলে নিলেন, আমার আর ভয় কি ?

কিছুকাল পরে মুন্সী বলিলেন আমাকে কলিকাতা লইয়া চল, আর বেশি দিন ভবধামে থাকিতে হইবে না। এই কথার পর তিনি সপরিবারে কলিকাতা যান, সেখানে মৃত্যুর পূর্বে বলেন যে, মা বলিতেছেন– আমি মরিলেও আবার বাঁচিব। এইরূপ কথোপকথনের পর ভাগিরথী তীরে দেহত্যাগ করেন। অনেক সময় পর্যন্ত পূর্বোক্ত বাক্যের কারণে দেহ রক্ষা করা হয়। কিন্তু এই জীবন সে জীবন নহে, তিনি মায়ের ক্রোড়ে নবজীবন পাইলেন, এই ভাবিয়া পরে দেহ সৎকার করা হয়।

তখন স্বামীজীর বয়স সতের আঠার-ই হইবে বোধ হয়। কিন্তু তিনি এই অল্প বয়সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিয়ম মতে শিবপূজা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন। একদিন এমতাবস্থায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ সন্ন্যাসী কয়েকটি কথা উপদেশ দিয়া একটি ছাগল নিকটে বাঁধিয়া রাখিতে বলেন, সেমতে কার্য করিলে ঐ ছাগল রাত্রিতে কথা বলিয়াছিল। ইহার পর আর একদিন একা নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কে যেন মধুর স্বরে ডাকিলেন– আনন্দবাবু, আনন্দবাবু, এই সকল আরও অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে লাগিল ও তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রহ্মভাবে হৃদয় পুলকিত হইতে লাগিল। আর একদিন তিনি ব্রহ্ম মন্দিরের মাঝে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া আছেন ও নানা কথা আন্দোলন করিতে করিতে মনে করিলেন যে, মৃত মনুষ্য সকলকে যদি দেখিতে পাইতাম তবে বড়ই আনন্দ হইত। এই কথার পরই ধ্যান-নয়নে দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহার পরিচিত মৃত এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছেন। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মুখ চিত্রপটে চিত্রের ন্যায় জ্যোতি চিত্রপটে ঝলসিতেছে ও নিকটস্থ ঐ পরিচিত নির্দ্দেশকারী ব্যক্তি প্রত্যেকের পরিচয় দিতেছেন,

বলিতেছেন– ঐ দেখ ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস, বাল্মীকি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিচয় করাইলেন, – ক্রমেই সংস্কারচ্যুত হইয়া ব্রহ্মভাবে বিভোর হইতে লাগিলেন ও বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা গেলেন। সেখানে নিজে পাক করিয়া নিরামিষ খাইতে লাগিলেন ও তখন স্বনামধন্য পুরুষ কেশব সেন জলন্ত প্রতিভার সহিত সর্বধর্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও প্রবল অনুরাগ ভরে ধর্ম চর্চ্চায় নিযুক্ত, সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কিছুকাল আলোচনা করার পর প্রচলিত হিন্দু রীতি-নীতির প্রতি বিতৃষ্ণা আসিল এবং কর্মন্যাসে ব্রহ্মভাবে ব্রাহ্ম আচার হৃদয়ে সত্য প্রকাশিত করিতে লাগিল। কাজেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীসহ বাড়ীতে আসিয়া ব্রহ্মভাবে উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে গ্রামস্থ ও সন্নিকটবর্তী সাধারণ ভদ্র ব্রাহ্মণ সকলেই নিতান্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া অত্যাচার করিবার উপক্রম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু অমানুষী শক্তি-প্রভাবে মহাপুরুষ ব্রহ্মমন্দিরেই ধ্যানে বসিয়া রহিলেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার কি করিবার সাহস হইল না। পরে অমিত তেজে বীরভাবে গ্রামে অল্প কয়েকটি লোকসহ সঙ্কীর্তন লইয়া বাহির হইলেন–

শমন দমন হবে যাতে রে
হরি বল বাহু তুলে।
হরির নাম কর সার, ভবসিন্ধু হবে পার,
রবিসুত দূত যারা পালাইবে ত্রাসেরে।
শুনিয়ে গোবিন্দ রব পালাবে পাষণ্ডী সব,
সিংহ রব শুনে যেমন করি পালায় বনেরে।
ভাই বন্ধু পরিবার কেবা সঙ্গে যাবে কার,
যারে বল আপন আপন সেত আপন নয় রে।
কলি যুগে দয়াময় জীবে দেখি দুরাশয়,
দয়াময় নাম সুধা রস ঘরে ঘরে যাচে রে।

এই নগর সংকীর্তনের প্রভাবে অপূর্ব জ্যোতি বহির্গত হইল। কালীকচ্ছ হইতে সরাইল পর্যন্ত রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভাবাবেশে পাগল– হিংসা দ্বেষ জাত্যাভিমান সকল ভুলিয়া গিয়া কি যেন কি এক শক্তির প্রভাবে একভাবে কলের পুতুলের ন্যায় সকল লোকসমষ্টি স্বামীজীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে সেদিনকার মত সংকীর্তন শেষ করিয়া ঘরে গেলেন। মানুষের মনে কত কিছু ছিল কিন্তু কাহারও কিছু বলিবারও সামর্থ্য রহিল না। ক্রমেই দর্শন ও বাণীর যোগ লাভ করিতে লাগিলেন ও নানা স্থান হইতে আদিষ্ট হইয়া লোকজন আসিয়া শ্রীচরণে প্রণতঃ হইতে লাগিল ও শান্তি পাইতে লাগিল। এদিকে বহুদিন কলিকাতা বাসের পর বাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ও অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন সেই সকল জঙ্গল আবার মঙ্গল ধ্বনীতে পূর্ণ হইতে লাগিল। প্রথমেই একটি কৈবর্ত সস্ত্রীক স্বামীজীর নিকট আত্মসমপর্ণ করিয়া বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া সঙ্গী হইলেন ও পরে ক্রমেই রোগী রোগ যন্ত্রণায়

অধীর হইয়া, দুঃখী দুঃখে তাপী তাপে তাপিত হইয়া স্বামীজীর চরণ গ্রহণে শান্তিলাভ করিতে লাগিল এবং তিনিও বিশ্বপ্রেমে অহেতুকী কৃপাতে সকলকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়া শান্তি দিতে লাগিলেন ও ভুবন বিজয়ী 'দয়াময়' নামের অপরিসীম মহিমা দিগ দিগন্তে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই 'দয়াময়' নাম প্রথমে কেশবচন্দ্র সেনের হৃদয় হইতে বাহির হয়। কিন্তু সর্বধর্ম, সর্বনাম, সর্ব সামঞ্জস্য যোগে জগতের মঙ্গলের জন্য সাধনার ভাবে স্বামীজীই 'দয়াময়' নাম প্রাণের সহিত উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধযোগ লাভে অবতারীভাবে এই নাম সকল নামের যোগে মানুষের হৃদয়ের ভাব সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রচার করিতে থাকেন।

এইরূপ প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বিষয় বলিয়া এবং আরও অনেকানেক অলৌকিক ঘটনা দ্বারা মানুষের মন বিস্ময়ান্বিত হইলে পর, গ্রামস্থ দুষ্ট লোকসকল একদিন এক ব্যক্তি দ্বারা একটি গরু ঘরে বাঁধাইয়া, স্বামীজীর নিকট তাহাকে লইয়া যাইয়া গরু কোথায় গিয়াছে জিজ্ঞাসা দ্বারা পরীক্ষা করিতে আসিল। স্বামীজী আসনে বসিয়া আছেন এমন সময় সমবেত লোক সকল আসিয়া চারিদিকে উপস্থিত হইল এবং ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি নালিশ করিল যে, আমার একটি গরু হারাইয়াছি– কোথায় গেল ? স্বামীজী একটু ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন– তোমার গরুটি ঘরেই বন্ধনে পড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে। সকলে শুনিয়া নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইল এবং বাড়ীর দিকে চলিল। বাস্তবিক যাইয়া দেখে– যে গরুটি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল সেইটি তদবস্থায়ই মরিয়া রহিয়াছে। অমনি সকলের প্রাণে ভয় বিস্ময়ের সহিত বিশ্বাসের রাজ্য আসিল। ক্রমে কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইল এবং তদবধি আর কেহ কোনও বিষয়ে অন্যয়াচরণ করে নাই বা করিতে সাহস পায় নাই।

ক্রমে দেশ দেশান্তরে মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনেক গণ্য মান্য ভদ্র ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, উকিল, ব্যারিষ্টার, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবাগিশ, গ্রাজুয়েট আসিয়া কেহ ধর্ম পিপাসায়, কেহ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া জুটিতে লাগিল। অনেকে অসাধ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কেহ বা অলৌকিকভাবে মুগ্ধ হইয়া জীবন বিকাইল। কেহ বা আপনার জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ শুনিয়া কেহ বা অলৌকিক প্রতিভা, অমানুষী প্রেম, অপরিমিত জ্ঞান, উদারতা, মহানুভবতা দেখিয়া জীবন ঢালিয়া দিল। তখন আর বাড়ীতে লোক ধরে না, পঞ্চাশ, ষাট, একশত ও একশত পঁচিশ জন লোক প্রতি বেলায় ভুক্ত হইত, খরচেরও কোন অভাব ছিল না। যে যাহা চাহিত সে তাহাই পাইত। বস্ত্রহীনে বস্ত্র, অন্নাভাবে অন্ন, কোনও কিছুর অভাব রহিল না। এই সময়ে বিক্রমপুর নিবাসী কামিনী কুমার ঘোষ শিষ্যত্ব গ্রহণে জীবন চরিতার্থ করেন। পরে দয়াল ঘোষ প্রভৃতি পনের হাজার লোক শিষ্য হয়েন। আমি অত্যল্প সময় মাত্র শ্রীচরণে সাক্ষাৎ রহিয়াছি, কাজেই অল্পমাত্র লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়।

এই সময়ে তিনি তত্ত্ব শাস্ত্রের বাহুল্য আন্দোলনে বহুতর অমীমাংসা দেখিয়া সর্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া ঈশ্বরের আদেশ প্রসূত "প্রকৃত তত্ত্ব" গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন ও অনেক সঙ্গীত রচনা করেন।

মহাপুরুষের অলৌকিক প্রতিভার কথা লিখা এ ক্ষুদ্র লেখনীর কিছুতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। বিক্রমপুরের একগ্রামে তিনি একবার যান। সেখানে ষোল সতের বৎসর বয়স্কা একটি কুলিন ব্রাহ্মণের কন্যা জন্মাবধি আতুড় অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছিল। মহাপুরুষের আগমণে শ্রীচরণ দর্শন করিতে ব্যাকুল হইয়া ঐ মেয়ে অতি কষ্টে সাক্ষাতে উপনীত হয়। আসিবামাত্রই স্বামীজী তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করেন, সেমতে ঐ মেয়ে তখনই স্বেচ্ছাক্রমে হাঁটিয়া গৃহে গমন করিল। সমবেত লোকজন এই অলৌকিক প্রতিভাতে মুগ্ধ হইয়া, স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

আর একদিন সরাইলের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র পল্লী-নীবাসী একটি আট নয় বৎসরের বোবা ছেলেসহ তাহার পিতামাতা স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কৃপা প্রার্থী হয়। তাহাতে স্বামীজী গণ্ডস্থলে স্পর্শ করিয়া 'দয়াময়' নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ দেন, তাহাতে অই ছেলে ঠিক স্পষ্ট ভাবে কথা কহিতে থাকে, তাহার পিতামাতা এই ঘটনার পর স্বামীজীর চরণে জীবন বিক্রিত করেন।

আর একদিন উৎসব উপলক্ষে কোনও শিষ্য প্রাতঃকালে মুখ হাত ধুইবার জন্য ঘাটে যাইতেছে, এমন সময় বিষধর সর্প দংশন করে। সে দৌড়িয়া যাইয়া স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়। তখন তাহাকে স্পর্শ করিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন, তাহাতে সে আরোগ্য হইল। কিন্তু কতক সময়ের জন্য স্বামীজীর দেহের সেই নির্ম্মল পরম জ্যোতি নীলবর্ণ হইয়া রহিল।

এইরূপ কোনও এক মুসলমান ব্যক্তির ভাই ডিব্রুগড়ে কাজ করিত, সেখান হইতে কোনও দুষ্ট লোক টেলী করিল যে, সে কলেরাতে আক্রান্ত– বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। সেই টেলীখানা হাতে করিয়া ঐ মুসলমান ভদ্রলোক কান্দিতে কান্দিতে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হয়েন, তাহাতে তিনি বলেন যে, তোমার ভাইয়ের জন্য চিন্তা করিও না, সে এই মুহূর্তে আজবপুর ষ্টেশনে একটা ঘোড়ার উপর চড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে, সত্বর যাও- ষ্টীমার আসিলে চলিয়া যাইবে। বাস্তবিক সে দৌড়িয়া যাইয়া দেখিতে পাইল ঐ ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া দাড়াঁইয়া আছে। অমনি তাহাকে লইয়া স্বামীজীর চরণ প্রান্তে শরণ গ্রহণ করেন।

নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যেক দিন এইরূপ ঘটনা ভুরি ভুরি ঘটিত। এই প্রকার সহস্র সহস্র অলৌকিক ঘটনাতে স্বামীজীর সুদীর্ঘ জীবন পরিপূর্ণ। তাহার কিছুমাত্রই আমি জানি না, মাত্র দু'চারটি কথা মনের আবেগে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে সময়ে আমি সেখানে ছিলাম তখন প্রায়ই আমাকে নানাবিধ রূপ গোপনে ডাকিয়া লইয়া দেখাইতেন ও স্নেহ ভরে উপদেশ দিতেন। এই কথা আমি প্রাচীন শিষ্য

গিরীশবাবুর নিকট ব্যক্ত করি, তাহাতে তিনি বড়ই উত্তেজিত হইয়া স্বামীজীর নিকট ঐরূপ রূপদর্শন প্রার্থী হয়। সেই সময় আমরা পাঁচ সাত জন নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম, যখন গিরীশবাবু এমত প্রার্থনা করেন তখনই দেখ বলিয়া স্থির হইলেন, আর অমনি শত শত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া একেবারে সমগ্র প্রকোষ্ঠখানা আলোকিত করিয়া ফেলিল। এরূপ মহান জ্যোতি আর কখনও দেখা যায় নাই। আমরা সকলেই একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

আর একদিন হবিগঞ্জ মুন্সেফি আদালতের সেরেস্তাদার উত্তম গৌরবর্ণ বিক্রমপুর নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ সকাল বেলায় স্বামীজী সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের জীবন বৃত্তান্ত জানিতে চায়। তখন কেবল একা আমিই নিকটে বসা ছিলাম, তাহার জীবন বৃত্তান্ত এইরূপ–

নয় দশ বৎসরের সময় তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে নিদারুণ প্লীহা যকৃৎ রোগে একেবারে মরণাপন্ন হয়েন এবং তদাবস্থায় আমাশয় হইয়া প্রত্যেক রাত্রিতে বিশ পঁচিশ বার বাহ্য হইতে থাকে, তাতে তিনি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া একদিন রাত্রিতে একখানা ধারাল দা শিয়রে রাখেন এবং তাহা দ্বারা ঐ রাত্রিতে আত্মহত্যা করবেন এই মনে করিয়া তিনি শুইয়াছেন অমনি তিনটি সন্ন্যাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দা খানা টানিয়া হাতে লন ও তাহাকে বলেন যে, তুমি আমাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর। কিন্তু সে তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন তাহাকে লইয়া সন্ন্যাসী তিনজন ঘর হইতে বাহির হয় ও এক গাছের পাতা ছিঁড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলে যে ইহার রস খাইলেই তোমার রোগ আরোগ্য হইবে। এই কথার পর হাতখানা টানিয়া হাতের উপর একটি বীজ লিখিয়া দিয়া যান ও বলেন যে, উহা কাহাকেও দেখাইবে না। এই বলিয়া তাহাকে আনিয়া আবার ঘরের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীত্রয় অন্তর্ধান হয়। তখন গৃহশুদ্ধ লোক সকলেই নিদ্রিত ঘরেরও কবাট বন্ধ, এমতাবস্থায় তিনি কি ভাবে বাহির গেলেন ও ঘরে আসিলেন বলিতে পারেন না। কিন্তু তাহার হাতে ঔষধের পাতা ছিল ও পায়ে কাদা ছিল। এই ঘটনায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঘরের লোককে জাগরিত করেন ও সেই বীজটির কথা ভিন্ন সকল কথা বলেন ও পরে ঐ পাতার রস খাইয়াই আরোগ্য হয়েন। ইহার প্রায় পনের ষোল বৎসর পর হবিগঞ্জ নিবাসী কোনও গ্রাজুয়েটকে তিনি নিজের হস্তস্থিত বীজটির উচ্চারণ জানিতে তাহার উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করেন ও জ্ঞাত হন। তাহাতে ঐ রাত্রে তিনি একা ঘরে শুইয়া আছেন এমন সময় খাটের নিচ হইতে প্রকাণ্ড এক হস্ত বাহির হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাটিতে ও তর্জ্জনী তাহার ললাটে দেখিতে পায়েন। তাহাতে অতিমাত্র আকুল হইলে এক বিরাটকায় পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আরক্ত লোচনে বলিতে থাকেন যে, তুই কেন হস্তস্থিত বীজ দেখাইলি– এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণটিও কম্পিত কলেবরে সেই রাত্রিতে আর ঘুমাইলেন না। অতঃপর অনেক দিন যাবৎ আর কোনও বিষয় জানিতেছেন না– এই ঘটনা স্বামীজী সম্যক বিবৃত করিলেন। আমি বসিয়াছিলাম, সেই বীজটি কে যেন আমার প্রাণের ভিতর স্পষ্টস্বরে বলিয়া দিতে

লাগিল, তখনই স্বামীজী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন– তোমার হাতে এই বীজটি লিখা দেখিয়ে আমার হৃদয়ের বাণীর সহিত ঐক্য হইয়াছে। পরমানন্দিত হইলাম– ঐ ব্রাহ্মণটিও অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই প্রকার অসংখ্য ঘটনাবলীতে মহাপুরুষের জীবন অলঙ্কৃত। অবতার ভিন্ন এমন ঘটনা সম্ভবে না। অদ্য পর্যন্ত জগতে স্বপ্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও স্থির মীমাংসা কেহ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, আমাদের প্রত্যেকের দিবা কি রজনীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র অনর্গল বলিয়া দিতেন।

প্রথম একদিন আমাদের মধ্যে প্রিয়বাবু দিবা নিদ্রাতে স্বপ্নে দেখেন– স্বামীজী মাটিতে গড়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমাদের নিকটে বলেন ও সকলে সমবেত হইয়া ইহার কারণ জানিতে যাই– যাইয়া বলিয়াছি। প্রিয়বাবু প্রশ্ন করিবেন অমনি বাধা দিয়া গুরুদেব বলিলেন– দেখিয়াছ "দয়াময় মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন।" অমনি আমরা সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইলাম ও সেই হইতে প্রায়ই আমাদিগের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেন ও বুঝাইয়া দিতেন।

একদিন আমরা সন্ধ্যার সময় স্বামীজীর সাক্ষাতে বসিয়া রহিয়াছি এমন সময় একটি উন্মাদের মত শিষ্য তাঁহারই ফুল বাগান হইতে কতকগুলা ফুল উঠাইয়া কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া নিয়া আসিয়া, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন– আমি কি জন্য আসিয়াছি, তখন স্বামীজী বলেন দশবার জপ কর– "আমি কি জন্য আসিয়াছি জয় দয়াময়"। তাহার জপ শেষ হইলে বলিলেন–

হামারি চামেড়া হামারি দোয়াল

হামারি পটাপট

অর্থাৎ এক চর্মকারকে এক ভদ্রলোক জুতা দিয়া দুই ঘা মারিয়া ছিল, তাহাতে সে ঐ কথা বলিয়াছিল– তবে স্বামীজী বলিলেন– আমারই বাগিচা আমারই ফুল আমাকেই দিতে আসিয়াছ, অমনি সে লম্বা হইয়া শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া গেল।

আর একদিন বড় গরম, রাত্রিতে বৃষ্টি নাই– আকাশ পরিষ্কার, আমরা বলিলাম এখন বৃষ্টি হইলে ভাল হইত। যেই এই কথা বলা অমনি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি নানা ভাষাতে অভিজ্ঞ ছিলেন, তদব্যতিরেকে একবার কয়েকজন মনিপুরী লোক, মনিপুরী ভাষায় স্বামীজীর নিকট কোনও বিষয় প্রার্থী হয়, তাহাতে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া মনিপুরী ভাষায় তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বধর্মী ছিলেন।

পরে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে তিনি কুম্ভ মেলাতে যান, সেখানে অগণিত সাধু সন্ন্যাসী সকলেই এক বাক্যে মহাপুরুষের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলিয়াছেন তথায় এত অসংখ্য লোকের মধ্যে একটি মাত্র লোককে তিনি পছন্দ

করেন ও তাহার নিকটে উপস্থিত হন, তাতে সে বলে পাদুকা ফেলিয়া আসুন, তাহাতে তিনি সেখানেও গেলেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মন্দিরের দরজায় বসিয়া ধ্যান করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করেন ও বৃন্দাবনের আরতির স্বরে "জয় দেব দয়াময়" দয়াময় নামের প্রভাত আরতি রচনা করেন ও সেই সকল দেশে "দয়াময়" নাম প্রচার করেন।

কত কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নজালে স্বামীজীকে জড়াইতেন। মাত্র দু' একটি কথায় তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া বিস্ময়ান্বিত করিতেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান– সকল জাতীয় লোক অভেদে স্বামীজীর চরণে প্রণত হইত।

১. স্ত্রী-পুরুষের বিশুদ্ধ মিলনই শুদ্ধ যোগ।

২. দেহ দেহী এক।

৩. মনুষ্যের কোন স্বাধীন শক্তি নাই, সকলেই নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

৪. ইন্দ্রিয় সেবাতে অতীন্দ্রিয় যোগ এবং দর্শন ও বাণী সাধকের সাধকতার অনেক জটিল প্রশ্ন যাহা আবহমানকাল হইতে কেবল তর্কের পর তর্কজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি অতি সরলভাবে মীমাংসা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। পুত্র মহেন্দ্রবাবু এল, এম, এফ পরীক্ষায় ফেইল হইয়া বাড়ীতেই খুব প্রতিপত্তির সহিত ডাক্তারী করিতেন। খুব উচ্চ বংশে তাঁহাকে বিবাহ করান এবং এক মেয়ে শ্রদ্ধেয় গুরুদয়াল সিংহের নিকট ও দ্বিতীয় কন্যা গ্রামস্থ শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস দত্তের নিকট প্রদান করেন। দ্বিজদাস দত্ত অক্সফোর্ডের এম, এ ও বিলাতে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সেই সময়ে "প্রকৃত তত্ত্ব" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস দত্তের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি কোনও সভায় বক্তৃতাচ্ছলে পণ্ডিত ম্যাকসমুলার সাহেবের নিকট "প্রকৃত তত্ত্ব" বিবৃত করেন, তাহাতে ম্যাকসমুলার সাহেব অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয়-জীবনাবধি অনন্ত বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহা স্থির করিতে পারি নাই– অধীন ভারতে এখনও এতবড় দার্শনিক বর্তমান, যাহার দুই চারিটি কথাতেই আমার জীবনের সকল জটিল প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়া গেল। এই কথা ম্যাকসমোলার সাহেব নিজ গ্রন্থে লিখেন ও চিঠি দেন এবং শ্রদ্ধেয় দ্বিজদাস দত্তকে বিশেষ কোনও উচ্চপদ প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন। কিন্তু দত্তবাবু আর বেশি দিন বিলাত রহিলেন না, শীঘ্রই দেশে প্রত্যাগমন করিয়া উচ্চ রাজকীয় কর্মে গৌরবান্বিত হইলেন।

বর্তমান জগতে প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেন কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিলেন– রুচি নাই

স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনেক আলোচনা হয়। আলোচনার পর স্বামীজী বিদায়কালে বলিলেন– গলায় ক্ষত হইয়া পরলোক গমনের যোগ দেখা যায়।

ধর্মবন্ধু দ্বারকাপ্রসাদ বলিয়াছে যে, একবার স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর পশ্চিম দিকে যায়, সেখানে কোনও নদীর পাড়ে মাটির নীচে এক সাধিকা মেয়ে বহুকাল হইতে বসবাস করিত। স্বামীজী একদিন বিকালে দ্বারকাকে সঙ্গে লইয়া হঠাৎ সেদিকে চলিতে লাগিলেন ও অনেক দূর গিয়া সেই মাটির তলায় গৃহমধ্যে যেন কত পরিচিতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বসিলেন– তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকটি পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিল, স্বামীজী পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিলেন ও নীরবে ঠোঁট নাড়িতে লাগিলেন, প্রায় এক ঘণ্টা কাল এরূপভাবে অবস্থান করিয়া হঠাৎ অমনি উঠিয়া রওয়ানা হইলেন।

প্রত্যেক শিষ্যের জীবনের সহিত অতি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তিনি মিশিয়াছেন ও প্রত্যেকেই তজ্জন্য নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত আছে। তাহার সকল ইতিহাস সংগ্রহ করা ও লেখা অতি দুরূহ ব্যাপারই বটে, তবে যদি কেহ মহাপুরুষের জীবনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন আর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তবে অনেক অমানুষী তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এমন কি অনেক ঘটনা আমারও মনে হইতেছে না।

কুমিল্লার ফকির আলেক বাবা সাহেবের সহিত তিনি প্রথম অবস্থায় একবার সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে বাবা সাহেব বলেন–

"সাবুদ করো কালেফ, মে মাবুদ কে।"

এই কথার উপর স্বামীজী বলিলেন

রসনা কর কাম, তেরী বন্দেগি আগর করে নাম্‌মে আছর, রিয়া বামনে রহু নাহি র তো কো বনিয়া দম্।

পেচস্ কি বিমার হে নাহি হেকিম পাস্ রাস্তাছে চলে

হো কহি নাহি সাথ নাম দার করম্ হক্ বন্দে পর তক্‌থা হরদম্।

ছাবোদ কর কালের মে মাবুদ কো পরতো বেছে যো

উছ্‌কা কিয়া পয়দা হর সাইকো মন্‌সা মিজাম জুম্ জুম্ মা ছাজি হুকম মে হেয় কুদরত মদাম।

এই সঙ্গীতটি তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া বাবা সাহেবকে শোনান, তাহাতে ফকির সাহেব অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দভরে মহাপুরুষ বলিয়া আলিঙ্গন করেন।

রাস্তায় ময়নামতির প্রসিদ্ধ ফকির হিল্লাল শাহ্ ফকিরের দরগায় অন্য কেহ ভয়ে প্রবেশ করিত না। কিন্তু তিনি যাইয়া শায়িত হিল্লাল শাহ্‌কে কোমরে ও গলায় ধরিয়া বসাইলেন। তাহাতে হিল্লাল শাহ্ হাসিতে লাগিলেন ও বড়বাবু বলিয়া ডাকিতে

লাগিলেন ও অনেক স্নেহ-মমতা দেখাইলেন এবং পুনঃ পুনঃ হাসিয়া হাসিয়া বড়বাবু বড়বাবু বলিতে লাগিলেন।

একবার কোথাও যাইতে নিতাই বাউলের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তাহাকে আহ্বান করেন কিন্তু বাউল না আসাতে তিনিও আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আবার পরে মধুনাথ নামক এক শিষ্যকে নিতাই বাউলের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাইয়া স্বামীজীর কথিত মতে বাউলকে বলে যে, স্বামীজী বলিয়াছেন- দয়াময় নাম ভিন্ন সাধন পূর্ণ হইবে না। তাহাতে বাউল অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া এক বোতল মদ তৎক্ষণাৎ পান করেন ও ক্ষনিক পরে বলেন হ্যাঁ, মা বলিয়াছেন। তবে আমি আর বেশি দিন থাকিব না, এইমাত্র বলিয়া বিদায় দেন।

নিতাই বাউল শব-সাধক ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। আমি তাহাকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, শৈশাবস্থা বলিয়া বিশেষ কিছু তখন বুঝিতে পারি নাই। তবে এইমাত্র মনে আছে যে, হাসি কান্না অবিরাম বদনে খেলিত ও কারণ পান করিতেন। একটি মরার মাথা মহাপাত্র ছিল। গ্রামের কানাই পাল ও জ্যেষ্ঠতাত অক্রুরচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার শিষ্য ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে যতদূর শুনিয়াছি বাড়ি গুনাইঘর ছিল, নারায়ণগঞ্জে চাকরি করিতেন। তথা হইতে রামদাস বাউলের কৃপালাভে তিনি এবং আরও তিনজন একত্রে চারিজন এক রাত্রিতে শব সাধনাতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে এক ব্যক্তি ভয় পাইয়া দৌড় দেয়। তাহাতেই তাহার জীবন শেষ হয়। দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তিকে– যে শবের উপর বসিয়াছিল, সেই শবই জীবিত হইয়া ঘাড়ে কামড় দিয়া শূন্যে লইয়া উড়িয়া যায়। মাত্র তিনি এবং আর একজন সূত্রধর সিদ্ধ হন। তাহাতেও আকাশ পাতাল ব্যাপী অনেক ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। এইভাবে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে কোনও জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করিতে থাকেন। তখন কাক্যাটেক নিবাসী মৎস্যজীবি জাতীয় একটি মেয়ে কাঠ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাকে দেখে ও তথা হইতে বাড়ীতে আনে, ঐ বাড়ীতেই তিনি সারা জীবন কর্তন করিয়া অনেক অলৌকিক লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। জল্লি গ্রামে চন্দ্রমনী কাচারু তাহার শিষ্য ছিল। শেষ জীবনে একবার তাহার বাড়ীতে আসেন ও রাত্রিতে বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকেন। তখন কি জানি এক কারণে ঐ চন্দ্রমনীর একপুত্র ঘরের পিছনে গাছের মধ্যে ফাঁসী দেয়। প্রভাতে দ্বিতীয় পুত্র তাহা দেখিয়া সেও সেও যাইয়া ফাঁসি দেয়। ক্রমে কিছু বেলা হইলে লোকজন আসিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ও নিতাই বাউল তখনই আশ্রমে চলিয়া যান এবং বলিতে থাকেন যে- তুরক সোয়ার খানে দরজাল আসিয়াছে, আর থাকিতে পারিব না– অঘাটে ঘাট হইবে, অপথে পথ হইবে, অমানুষ মানুষ হইবে, গ্রামে গ্রামে বাজার হইবে। পিতা-পুত্রে বিবাদ হইবে ইত্যাদি। ঝড়ও আরম্ভ হইয়াছে– ধান হইলে থাকিবে, চিটা উড়িয়া যাইবে। এই সকল বাক্য বলিতে থাকেন ও কিছুকাল পরেই দেহত্যাগের ভান করেন ও দেহত্যাগ করেন।

তিনি মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেন। জলের নীচে ডুব দিয়া অধিক সময় থাকিতে পারিতেন ইত্যাদি আরও অনেক অমানুষী ঘটনা দেখাইয়া যান। এই নিতাই বাউল স্বামীজীর সমসাময়িক সাধক ছিলেন।

স্বামীজী তৎকালীন সকল সাধকের সঙ্গে নানা প্রকারে সাক্ষাৎ করিয়া এই যুগে "দয়াময়" নামের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করেন। ভাবে জীব, ভাবে শিব, কতকগুলি সংস্কারাবদ্ধ ভাবসমষ্টি লইয়া জীবত্ব, আবার কতকগুলি ভাবের সংগ্রামে হৃদয় নিহিত অসম্পূর্ণ ভাব সকলকে পরাজিত করিয়া অবিচ্ছিন্নপূর্ণ ভাবকে লাভ করাই সাধনা ও শিবত্ব– স্বামীজী এক ব্রহ্ম দয়াময় নাম যোগে সকল নামের সাধনের বিধান করিয়া ভাব সংগ্রামের অতি উৎকৃষ্ট নূতন পন্থা জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন। কাজেই তাহাকে অবতার না বলিয়া আর পারিতেছি না।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতিভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম"
"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীতা)

উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ধর্ম জগতে ও কর্ম জগতে নানা ধর্মের বিশ্লেষণে যে গুরুতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সর্বধর্ম সামঞ্জস্য তাহারই মীমাংসা যোগ লইয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন। এই দয়াময় নামে ও "প্রকৃত তত্ত্বের" প্রকৃত পন্থায় একদিন জগত দীক্ষিত হইয়া সত্যের জয়ধ্বনি করিবে ইহাই তাহার আদেশ এবং আমার হৃদয়েও এই বিশ্বাস প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে ধর্মজীবন পূর্ণ হয় না, আর বিশেষতঃ জীব মাত্রেই কামিনী-কাঞ্চন জড়িত যদিও কেহ কেহ ভাবাবেগে উচ্ছাসভরে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ বলিতেন। কিন্তু মূলতঃ তাহা হইতেছে না, যেহেতু কামিনীর তো সংস্পর্শ ছাড়িলেন, কাঞ্চন ছাড়িলেন কৈ। কাঞ্চন ছাড়িলে আহারাদি বস্ত্রাদির ব্যাঘাত ঘটিয়া জীবনসংশয় ভাব আনয়ন করে, বলিবেন– কাঞ্চনে অনাসক্ত, তবে অনাসক্তভাবে কামিনী রাখেন না কেন? একেবারে পরিত্যাগ কেন ? দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি ঈশ্বরেরই বিশেষ ইচ্ছাপ্রসূত। কামিনী ত্যাগে সেই ইচ্ছার ব্যাঘাত যোগ হয়। যদি এই আদর্শে জগত চালিত হয় তবে সৃষ্টি শূন্য হইবারই কথা– অতএব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ জগতের আদর্শ হইতে পারে না,– কোনও ব্যক্তির জীবনে আবশ্যক থাকিলেও সাধারণে এরূপ উপদেশ সঙ্গত নহে– এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ও যুক্তি স্থানান্তরে লিখা হইয়াছে বলিয়া এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে অনাসক্ত সংসারী ভক্তই পূর্ণ মনুষ্য বলিয়া স্বামীজী তাহার আদর্শ দেখাইয়া আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন।

মহাপুরুষের অলৌকিক ঘটনা ও অমানুষী প্রতিভাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ব নহে বলিয়া পুনঃ পুনঃই বলিতেছি। তবে এই ক্ষুদ্র

জীবনে স্বামীজীর চরণ-রেণু সংস্পর্শে জড়িত বলিয়া কয়েকটি কথা মাত্র এ স্থলে ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের সামান্য রকম আবেগ তৃপ্ত করিতে চেষ্টা পাইলাম মাত্র।

আমার মত এমন কত শত শত অতৃপ্ত হৃদয়ের কাহিনী স্বামীজীর চরণে পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় পতিত হইয়া আনন্দময়ের আনন্দ রাজ্যে আনন্দ পাইয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছেন। কত অন্ধ চক্ষু পাইয়াছে, কত আতুর হাটিয়াছে, বোবা কথা বলিয়াছে, মুর্খ তত্ত্ববিদ পণ্ডিত হইয়াছে, বাচাল স্তব্ধ হইয়াছে, শান্তমনা ব্যক্তি বাচাল হইয়াছে, কত বিপথগামী নরনারী পথ প্রাপ্ত হইয়া পথের দিকে, আবার কত শত নরনারীকে আনন্দময়ের চরণে দয়াময় নামে টানিয়া আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও একটু অভিনিবেশ সহকারে এখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনিই মাত্র তাহা বুঝিতে ও জানিতে পারিবেন।

স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ মহেন্দ্রবাবু নির্ভরের ভাবে অনাসক্তি নিয়া ঐ মহাপুরুষের আসনে বর্তমান সময়ে আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। তিনিও অতি উন্নতমনা, শান্ত মহাপুরুষ বটেন- আমি শ্রীশ্রীগুরুদেব আনন্দ স্বামী ও তাঁহার সকল বংশধর, ভক্তবৃন্দ, অনুগৃহীত প্রত্যেককে কাতর ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে প্রণাম করি– আমার জীবন ধন্য।

ধন্য ধন্য "দয়াময়" নাম শ্রীআনন্দ অবতারে
সর্বধর্ম সমন্বয়ে, জীবন্মুক্তি এল দ্বারে।
অন্য যত অবতারে,
কাহারে কাহারে তারে,
ধন্য দয়াল অবতারে, যারে তারে, তারে তারে।
পড়িয়ে ভব পাথারে,
হেলায়ে ডাকিলে তারে,
মিলয়ে মমতা করে, ত্বরায়ে তারিতে তারে।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে,
সে ভাবে সে পাবে তাঁরে,
কেহ যারে নাহি তারে, সে তাঁহারে তারে তাঁরে।
মোহ মৃত্যু ব্যাধি ঘোরে
দয়াময় নামে তারে,
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে, প্রেমানন্দ কেলী করে।
মনোমোহন মন তাঁরে,
নিয়ত ভাবিছে তাঁরে,
অযাচিত হৃদিদ্বারে, করুণা দেখি কাতরে।

গগন ভট্টাচার্যের সহিত ধর্ম বিষয়ে তর্ক যুদ্ধ
১৩০৭ বাংলা শ্রাবণ

শ্যামগ্রাম নিবাসী গগনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বহু সংখ্যক শাস্ত্র ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া 'মুক্তি সোপান' নামে একটি বহি লেখেন। পরস্পর পরিচিত হওয়ায় তিনি তর্ক যুদ্ধে আমাকে গত ফাল্গুন মাসে আহ্বান করেন। ভুবন বিজয়ী "দয়াময়" নামের মহিমা ও গুরু কৃপাতে একটি রাত্রি তর্ক হওয়ার পর, তিনি আত্মপক্ষ ত্যাগ করিয়া আমার যুক্তিজালে জড়িত হন ও নিতান্ত আগ্রহের সহিত আদর অভ্যর্থনা করেন এবং ইহার অল্প পরেই একখানা শ্রীমদভাগবত পাঠাইয়া দেন।

স্বপ্নযোগে ধুমাবতীর আদেশ

শ্রাবণ মাস হইতে শ্রীমদভাগবত পাঠ করিতে থাকি। প্রত্যেক দিন বিকালেই গোপাল সাধুর আখড়াতে ভাগবত লইয়া বসিতাম, দু'একজন শ্রোতাও মিলিত, তাহার মধ্যে গোপাল সাধু এবং অশিতিপর বৃদ্ধ ভদ্রমনি প্রধান। এইভাবে পাঠ কার্য্যে প্রায় ভাদ্র মাসও শেষ হইল। তখন একদিন স্বপ্নে দেখি "ধুমাবতী" নৃত্য করিতেছেন ও বলিতেছেন– একটি শিশু ও একটি কুকুর বধ হইবে। বুড়ি নাম্নি অতি পরমা সুন্দরী আড়াই বৎসর বয়স্কা আমার একটি ভগ্নি ছিল। এই দর্শনের দুই একদিন পরেই তাহার সমুদয় শরীর শোথে ভারাক্রান্ত হইয়া ফুলিয়া গেল ও ক্রমে ৩রা আশ্বিন অল্প বেলা থাকিতে পেটে বেদনা হইয়া চিৎকার করিতে করিতে বলে যে, ভাত খাইব। ভাত পাক হইতেছে– বাবা কোলে নিয়া হা হুতাস করিতেছেন এমন সময় আমি কোলে টানিয়া লইয়া রান্নাভাত দেখাইতেছি, হঠাৎ একটি চিৎকার দেওয়ার পর মৃত্যু হয়।

সকলে নিতান্ত কান্নাকাটি করিয়া শুইয়া অচৈতন্যের ন্যায় আছে, এদিকে শবদাহ হইতেছে। রাত্রি প্রায় প্রভাত– মা হঠাৎ চৈতন্য হইয়া চিৎকার করিয়া বাহির হইবেন, অমনি দেখেন আমাদের গৃহ পালিত কালবর্ণ কুকুরটি দরজা বরাবর শুইয়া মরিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইল।

পিতৃদেব নিতান্ত কোমল অন্ত:করণ লোক ছিলেন। এই ঘটনার তিন চারদিন পর ছোট খুড়া বাঁশের ঝাড় হইতে একটি বাঁশ কাটেন ও নামাইতে না পারিয়া পিতামহাশয়কে বলেন যে, আপনি একটু ধরেন। সেই বাঁশখানা খুব জোরের সহিত নামান হয়, তাহাতেই পিতৃদেবের হৃদকম্পন হয় ও হৃদ রোগের সৃষ্টি হয়। এই সময় হইতে কখন কখন সুস্থ থাকিতেন কখন কখন নিতান্ত অধীর হইতেন।

পরলোক হইতে ভদ্রমণির আগমন

অগ্রহায়ণ মাসে পূর্বে উল্লেখিত ভাগবত শ্রোতা ভদ্রমণি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইল। তাহাকে পূর্বে প্রত্যেকদিনই বলা হইত যে, তুমি মৃত্যুর পর কি ঘটনা জানাইবে। ঠিক মৃত্যুর কতক সময় পূর্বে যাইয়াও আমি দয়াময়ের নাম শুনাইতে লাগিলাম। এবং ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তাহার মৃত্যু হইল, তিন দিন পর স্বপ্নযোগে দর্শন পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কেন আসিয়াছ ?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিয়াছি।

প্রশ্ন ঃ কেমন আছ ?

উত্তর ঃ স্বর্গও দেখিনা নরকও দেখিনা, অনন্ত শূন্যে বেশ সুখে ভ্রমণ করিতেছি।

প্রশ্ন ঃ আর কাহাকেও দেখিতে পাও ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অসংখ্য জীব-আত্মা শূন্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ইত্যাদি।

পূর্বে একটি কথা লিখিতে ভুলিয়াছি– ১৩০৬ সনের চৈত্র মাসে কলেরা রোগে ছোট খুড়ী ও ছোট খুড়ার দিকের বড় ভাইটি দেহ ত্যাগ করে। আমারই প্রথমে ডাইরিয়ার মতন হইয়া পশ্চাতে বিশেষ দৈববাণীতে আমি ভাল হই ও তাহাদের মৃত্যু হয়। পরে ছোট খুড়া আবার বিবাহ করেন এবং ১৩০৪ সনের আষাঢ় মাসে কনিষ্ঠা ভগ্নি হেমন্তকে জাফরগঞ্জ বিষ্ণুপুর নিবাসী কৃষ্ণকুমার দে'র সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

ক্রমে ১৩০৭ সন শেষ হইলে নানা আলোচনাতে, ধর্মগ্রন্থ পাঠে, কবিতা লিখায়, সঙ্গীত রচনায়, তত্ত্ব বিবৃতিতে দিন কর্ত্তন করিলাম। কিন্তু স্বামীজীর তিরোভাবে মনে নিতান্তই নিরাশ ভাব খেলিতে লাগিল। মনের লক্ষ্য ক্রমেই হীনবল হইয়া গেল। তবে প্রায়ই ভাবনা হইত যে, যদি দয়াময় আমাকে প্রচার কার্য্য দিতেন, ফুল বাগিচার মধ্যে একখানা ঘর হইত ইত্যাদি। পূর্ব লিখিত হরিমোহন বর্তমান ফুল বাগিচার সৃষ্টি আরম্ভ করেও ইহার কিছুকাল পরেই সে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে গোপাল সাধুর আখড়ায় নানা কথাতে কোনও রকম শান্তি রক্ষা হইত।

বিবাহ

১৩০৮ সন

১৩০৮ সনের প্রারম্ভে বিষয় কর্মের উদ্যোগে কোথায় যাইব কি করিব এই চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ক্রমে ভাদ্র মাস নিকটবর্তী হইল তখন পিতৃদেব যাত্রাপুর গ্রামে আমাদের কুলগুরু ইষ্ট দেবতার সঙ্গে দেখা করিতে নৌকাযোগে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

মোচাগারা গ্রামে প্রস্তাব

দৈববাণী- এই বিবাহ হইবে না

সেখান নিকটবর্তী মোচাগাড়া গ্রামের বনমালী ঘোষ নামীয় এক অবস্থাসম্পন্ন ভদ্রলোক আছেন। আমি যখন মোক্তারী পরীক্ষার ফিস দিতে কুমিল্লা যাই তখন বলরাম সরকারের হোটেলে ছিলাম, বনমালী ঘোষও তথায় ছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে এক অন্ধ সেখানে সঙ্গীত করিতে উপস্থিত হয় ও ভুবন রায় রচিত অতি উত্তম স্বরে দুই তিনটি সঙ্গীত করে। তাহাকে আমি দুটি পয়সা দেই। বনমালী ঘোষও কিছু দেন। তখন নানা কথার পর বনমালী ঘোষ আমাতে আকৃষ্ট হন ও তাহার বাড়ী হইয়া আসার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করেন। আমি নানা অযুহাতে সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই। ইহার পর তিনি তাহার মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া দুই তিন বার লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু অভিভাবকের অমতে কিছুই হয় নাই। এবার পিতৃদেব যাত্রাপুর গিয়াছেন শুনিয়া বনমালী ঘোষ আমাদের কুল গুরুকে বিশেষভাবে বাধ্য করিয়া পিতা মহাশয় সহ বিবাহ সুস্থির করিয়া কতক টাকা নগদ দিয়া দুই দিনের মধ্যেই বিবাহের তারিখ নির্ধারিত করেন। এদিকে পিতৃদেবের বাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা চিন্তিত হই, পরে তিনি একেবারে টাকা ও নির্বন্ধ পত্রসহ বাড়ী আসেন। পরের দিনই বাজার হয় তারপর দিন বিবাহ হইবে, লোকজন বাদ্যকর নৌকা সব প্রস্তুত, রওয়ানা হইব ইহার কিছু পূর্বে আমি শুইয়া ছিলাম, ঈষৎ তন্দ্রার আবেশ হইয়াছে এমত সময় দৈববাণী হইল তোমার এ বিবাহ হইবে না। জাগিয়া মাকে বলিলাম। তাহারা সকলেই আমাকে নিতান্ত গালিগালাজ করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা একপ্রহর হইয়াছে এমন সময় সংবাদ আসিল– সে বিবাহ তাহারা রহিমপুর দিতেছে, এখানে দিবে না। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই হতভম্ব হইলেন পুনরায় চেষ্টা করিয়াও আর কিছু হইল না। খরচপত্র সব পণ্ড হইয়া গেল।

ছয়ফুল্লাকান্দি গ্রামে বিবাহের প্রস্তাব

দৈববাণী– এই বিবাহ হইবে, তবে অনেক গোলযোগ আছে

এদিকে ছয়ফুল্লাকান্দি নিবাসী দীননাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য পূর্বে হইতেই লোক পাঠাইতেছিলেন। অভিভাবকদের অমতে হইতেছিল না। এই সময়ে শ্রীমন্ত কৃষ্ণ নাথ কবিরাজ মহাশয় ছয়ফুল্লাকান্দি কোনও রোগী চিকিৎসা করিবার জন্য যান। সেখানে দীননাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে বিবাহ না হইবার কথা বলেন ও দীননাথ দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করেন, তাহাতেই তাহারা অগ্রসর হইয়া সুযোগ বুঝিয়া আমাদের এখানে আইসে ও কথোপকথান্তরে বিবাহ স্থির হয়।

১৩০৮ সনের ২৭শে ভাদ্র রবিবার বিবাহের দিন সাব্যস্থ হইল। আবার আয়োজন আরম্ভ হইল। বিবাহের পূর্বের দিন রাত্রিতে স্বপ্ন হইল,– এই বিবাহ হইবে, তবে ইহাতেও অনেক গোলযোগ আছে।

প্রভাতে বাড়ীতে জানাইলাম– সকলেই নিরতিশয় বিষণ্ন। এদিকে বিবাহের পূর্বের দিবস এত প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ হইতে আরম্ভ করিল যে, সারা দিনের মধ্যেও সূর্যদর্শন হইল না। এদিকে পুষ্করিনীর নালা ছুটিয়া অতিরিক্ত জলের বেগে সকল মাছ বাহির হইয়া গেল। বাড়ীতে লালসা বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে বাহিরে ঠাকুর বসিয়াছেন, পূজা শেষ না হইতেই নৈবেদ্য বৃষ্টিতে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই রকম ঘটনা চক্রের পর সেদিন কাটিয়া গেল, পরের দিনও বেলা এক প্রহর পর্যন্ত অবিরাম বর্ষণ। বাহির হইবার যো নাই, দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। আমি শুইয়া শুইয়া ঘটনা ভাবিতেছি এমত সময় তন্দ্রা হইল– দেখিলাম সূর্যোদয় হইয়াছে। তন্দ্রা ভাঙ্গিলে বলিলাম– বৃষ্টি এখনই ছাড়িবে। বাস্তুবিক পরক্ষণেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যোদয় হইল। আহারাদির পর রওয়ানা হইলাম। যাইতে যাইতে সন্ধ্যার সময় বিলে যাইয়া আবার বৃষ্টি নামিল। নৌকা কিছুকালের জন্য রাখা হইল। প্রায় পনের বিশ মিনিট পরে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

বিবাহ বাসরে গোলযোগ

বাড়ীতে বহুতর লোকজন– আনন্দের কোলাহল, বেশ আনন্দে সকলে বসিয়াছি– বিবাহের লগ্নও নিকটবর্তী, দেখিতে দেখিতে পনের বিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ীতে আর কোনও সাড়া শব্দ নাই। খুঁজিয়াও লোকজন পাওয়া যায় না– দেখিয়াতো সকলে অবাক, ব্যাপারখানা কি হইল।

অনুসন্ধানে জানা গেল তাহাদের মধ্যে কে বলিয়াছে যে, আমার একচক্ষের দৃষ্টিশক্তি নাই। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সকলেই যার যার ভাবে নীরবে বসিয়া আছে। বিবাহ আর দিবে না, আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে, এইরূপই সাব্যস্থ হইল। তাহাতে অনেক আলোচনার পর পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ এবং মেয়েদের মধ্যেও কেহ কেহ নিকটে আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। লীলাময়ের কি আশ্চর্য লীলা– তখন নাকি সকলেই আমার চক্ষু ঘোলা ও রক্তবর্ণ এবং একটু দৃষ্টিশক্তিহীন দেখিতে পাইল। তাহাতে বিবাহ হইবার আর কোনও কথাই নাই।

বিবাহ সম্পন্ন

বিবাহ হইবার সম্ভাবনা না দেখায়, ছয়ফুল্লাকান্দি হইতে আমাদের ফিরিয়া আসার সিদ্ধান্ত নিতে হইল। উঠিয়া রওয়ানা হইলাম, আমার বিবেক তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। অর্দ্ধপথে আসিয়া খুড়া মহাশয় ও বিদ্যারত্ন পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া দাঁড়াইয়া শরীরের সকল কাপড় খুলিয়া দিলাম এবং বলিলাম– দেখুন, ভগবানের ইচ্ছা নাই যে, আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ও সংসার করা। আমার জন্য সন্ন্যাসই নির্দিষ্ট রহিয়াছে নতুবা জগতে কত কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, মুর্খের বিবাহ হইয়া যাইতেছে, আর আমাকে সকলেই ভাল বলিয়া জানে, তাহাতেও এই রকম অবস্থায় বিবাহ হইতেছে না। কাজেই আমি সন্ন্যাসী হইব। পিতা-মাতাকে বলিবেন যে, তাঁহাদের পাঁচ পুত্র আছে, না হয় এক পুত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সন্ন্যাসীই হইল, তাহা ভালই বটে। এই প্রকার বাক্য বলিতে থাকিলে তাহারাও স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল। আর কি বলিবেন, কতক্ষণ পরে আমি এক রকম রওয়ানা হইব, রাত্রি চারি দণ্ড আছে এমত সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার হাতে ধরিয়া বলিলেন– মনোমোহন জীবনে তোমাকে আমি কোনও কথা বলি নাই। আরও বিশেষতঃ জানি যে, শিশুকাল হইতে তোমার হৃদয় বিবেকী ঘটনা চক্রেও তাহাই দেখিতেছি। অতএব তোমাকে আর কিছু বলিতেছি না, মাত্র এই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তুমি অপেক্ষা করিয়া যাইবে, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে। পরে রাত্রি প্রভাতে যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া যাইও, কেহই নিষেধ করিবে না। তোমার পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিবার ভার আমার হাতে রহিল। বিদ্যারত্নের এই কথায় যাহা নির্দিষ্ট তাহা হইবে হঠাৎ কোন কার্য করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া রাত্রিটুকু অপেক্ষা করিবার জন্যে নৌকায় উঠিয়া শুইলাম। নানা চিন্তায় তন্দ্রাবেশ হইল– দেখিতে পাইলাম দিগন্তব্যাপী এক শ্বেতবর্ণ জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছে ও তাহার মধ্য হইতে দৈববাণী হইতেছে– বিবাহ হইবে, কোনও চিন্তা নাই। এই কথার পর আরও অনেক অলৌকিক দর্শন হইতে লাগিল, আমি আত্মহারার ন্যায় সেই পরম রূপসাগরে ডুবিতেছি ও ভাবিতেছি মাত্র।

ইত্যবসরে গ্রাম হইতে এক নাপিতের বধু– ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স হইবে, সে উন্মাদ হইয়া উলঙ্গাবস্থায় নৌকা ঘাটে আসিয়াছে এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে এবং বলিতেছে– জামাইবাবু নামেন, শীঘ্র নামিয়া আসেন, আমি কলসী কলসী জল উঠাইয়া রাখিয়াছি, স্নান করাইয়া জামাই সাঁজাইব, মেয়ে বিবাহ দিব। কোন্ শালায় কি করিবে, যদি কেহ বাঁধা দেয় কি বিবাহ না দিতে চায়, তাহাদের বংশ নির্মুল করিব। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিল। নৌকাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ান্বিত হইয়া শুনিতেছে।

এই চীৎকারে আমারও সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন প্রায় পূর্বাকাশে ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে। চাহিয়া দেখি এক পাগলিনী উলঙ্গাবস্থায় এমত বাক্য সকল চীৎকার করিয়া বলিতেছে, সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে, এমন সময় গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিতে দেখা গেল আর কতকজন আমাদের নৌকায় চড়িল।

খুড়া মহাশয়, পুরোহিত বিদ্যারত্ন এবং সিং বর্গান সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সমাগত ভদ্রলোক সকল নিতান্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত গত রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে নানা আপত্তি দর্শাইয়া মাপ চাহিতে লাগিল এবং বাড়ীতে উঠাইয়া বিবাহ করাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বরপক্ষ স্বীকার করিতেছেন না, পরে অনেকানেক আলোচনার পর মত সাব্যস্ত হইল– বাড়ীতে গেলাম।

এদিকে বিবাহ ফিরিয়া যাওয়ায়, কৃষ্ণনাথ কবিরাজ মহাশয়কে পুনঃ ফিরাইয়া আনার জন্য আবার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার অনেক পরে কবিরাজ মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষ হইতে পুরোহিত ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলিতে তিনি আমাদিগের যজমানত্ব ছাড়িয়া দেন ও বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরোহিত হন।

১৩০৮ সনের ২৮শে ভাদ্র সোমবার। ২৭শে রবিবার বিবাহের তারিখ ছিল, সে তারিখে আর হইল না। সোমবার আমার জন্মবার, ঐ সোমবারেই গোধুলিতে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

আমাদের মধ্যে অনেকের প্রতিহিংসা ছিল যে, বিবাহের পরেই বাড়ীতে রওয়ানা হইবে, কিন্তু অনেক কথার পর আর তাহা হইল না। সেদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া পরেরদিন নিয়ম মত আহারাদির পর রওয়ানা হওয়া গেল। প্রায় রাত্রি প্রভাত সময় বাড়ীতে আসিলাম, পিতামাতার মনের আনন্দ পূর্ণ হইল।

কার্তিক মাসে দ্বিতীয় ভগ্নি নির্মলাকে রছুল্লাবাদের গিরিশ চন্দ্র দেবের নিকট বিবাহ দেওয়া হইল।

ক্রমে নানা আন্দোলনায় বৎসর শেষ হইতে চলিল, চাকুরি বিষয়ের চেষ্টার জন্য বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল, আমিও নিতান্ত হতাশের ন্যায় নানা দিকের কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে বৎসর শেষ হইল।

চাকুরীর সন্ধানে যাত্রা শঠের পাল্লায় লাঞ্ছনা
১৩০৯ সন

সর্বদাই গোপাল সাধুর আখড়াতে আসা যাওয়া করিতেছি, বৈশাখের প্রায় শেষ ভাগে একদিন দুই প্রহরের সময় আখড়ার ঘরে বসিয়াছি এমন সময় আমাদের পুষ্করিনীর পাড়ের গুরুদয়াল চাঁদ নামে ত্রিশ একত্রিশ বৎসরের একটি যুবা ছেলে সেখানে উপস্থিত হইল। নানা কথার পর হঠাৎ তাহাকে বলা হইল– গুরুদয়াল, শীঘ্রই তুই পাগল হইবি, এই কথাতে সে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

ইহার অল্পদিন পরেই মনে করিলাম ময়মনসিংহে অনেক জমিদার আছে তথায় কোন জমিদার বাড়ীতে যাইয়া চাকুরি লইব। এই চিন্তা করিয়া একদিন সকালে তদাভিমুখে দেড় টাকা, পৌণে দুই টাকা সম্বল লইয়া রওয়ানা হইলাম।

সর্ব্ব প্রথমে যাইয়া কালীকচ্ছ উপস্থিত হইলাম, সেখানে গুরুপুত্র পূজ্যপাদ মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটাইলাম, প্রায় উপাসনার সময় জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডল ও সূর্য দর্শন হইত। একদিন দেখিলাম গুরুদেব দাঁড়াইয়া বলিতেছেন– আরও উপাসনা আবশ্যক। এইভাবে দিন কাটাইয়া, পূজ্যপাদ মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কোথায় যাইব, তিনি বলিলেন যেদিকে রক্তবর্ণ দর্শন হয় সেদিকে যাও, তাতে বিশেষ কোনও দর্শন হইল না,– এদিকে পূজ্যপাদ মহেন্দ্র বাবুরই এক নৌকা বাজিতপুর যাওয়ার আবশ্যক হইল। আমি সেই নৌকাতেই ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম।

অল্প বেলা থাকিতে বাজিতপুরের সাহাপুর আসন বাড়ীতে পঁহুছিয়া আহারাদি করিলাম- রাত্রিতে ভাত খাওয়া হইল। প্রভাতে জাগিয়া রাজপথ ধরিয়া রওয়ানা হইলাম, কোথায় যাইব ঠিক নাই, তবে গোপাল সাধুর সহধর্মিনী ইচ্ছাময়ীর পিত্রালয় কট্টাদি বাজারের নিকট হাউল্লাপাড়া গ্রামে, তাহারই ভগ্নিপুত্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। সেই পরিচয়ে আশ্বস্থ হইয়া পথ চলিলাম। সারাদিন হাটিয়া প্রায় চার ছয় দণ্ড থাকিতে ঐ হাউল্লাপাড়া গ্রামের নিকট ঈশ্বরকুমার নামক স্বামীজীর এক শিষ্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, চেয়ে দেখি তাহার সর্বশরীর ঘা হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, সে মশারীর নীচে পড়িয়া আছে, দেখিয়াই আর বসিলাম না। আমাকেও কেহ চিনিল না। তাড়াতাড়ি হাউল্লাপাড়ার ঐ বাড়ীতে পৌছিলাম ও দুই দিন তথায় অপেক্ষা করিয়া আবার চলিলাম, বেলা এক প্রহর সময়ে গোপীনাথজীর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে দরজা বন্ধ বলিয়া গোপীনাথ দর্শন ঘটিয়া উঠিল না, পূজক বলিল- দুই প্রহর পর্যন্ত থাকিলে হইতে পারে। কিন্তু মন আর স্থির হইল না, কাজেই উঠিয়া চলিলাম। বেলা দুই প্রহরের সময় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি থাকিয়া আহার করিয়া রওয়ানা হইলাম। চলিবার পক্ষে সে দিনকার পথগুলো অতি সুন্দর- মাঝে মাঝে বাজার আছে। আর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই

রাজপথে হাটিয়া চলে,-যাইতে যাইতে এক সন্ধিস্থলে পঁহুছিলাম। সেখান থেকে এক পথ হুসেনপুর এবং এক পথ কিশোরগঞ্জ, হয়বতনগর জঙ্গলবাড়ী গিয়াছে, সেখানে কিছুক্ষণ দাড়াইলাম, এক পথিকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে বলিল হুসেনপুর জামিদারদের কাচারী আছে, তথায় সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে ঐ কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি কেবল ইতস্ততঃ করিতেছি এমত সময় দেখি একটি শৃগাল আমার বাম দিক দিয়া রওয়ানা হইয়াছে। যদি হুসেনপুর যাই তবে শৃগালটি বাম দিকেই থাকে, কিশোরগঞ্জ গেলে পশ্চাত পড়ে, বামে শেয়াল অতি শুভযোগ, কাজেই অগত্যা খুব বলের সহিত শৃগাল বামে রাখিয়া চলিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময় হুসেনপুর পৌঁছিলাম, নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদী, পারে বাজার অতি সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। কিছু কাল বেড়াইয়া এক হোটেলে আশ্রয় নিলাম- রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে, শরীর বড় অবসন্ন, তাই মনে করিলাম যে, সেদিন তথায় বিশ্রাম করিয়া পরের দিন আবার পথ চলিব। বিশেষতঃ সেখানেও জমিদারের দুইটি কাচারী আছে, একটু চেষ্টা করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ তথা হইতে আঠার বাড়ী ঠিক এক দিনের পথ। তবে আঠার বাড়ীতে স্বদেশস্থ ভোলাচঙ্গের কৃষ্ণদাস চৌধুরী নায়েবীতে আছেন। এই একটু ক্ষীণ আশালোক হৃদয়ে সামান্য ভরসা ও আনন্দ দিতেছিল।

অগত্যার পর অনেক চিন্তা করিয়া সেদিনের জন্য হোটেলে রহিয়া গেলাম, যেন বিশ্রাম সুখে বসিয়াছি। নানাবিধ লোকজন, ভাব গতিক, আচার ব্যবহার দেখিতেছি, তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে, এমন সময় একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণকায় বেশভুষাতে বেশ বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া আমি যে হোটেলে আছি সেখানে নিকটেই বসিয়া দুই পয়সার চিড়া লইয়া খাইল এবং এক পয়সার পান খরিদ করিল। তাহার একটি পান আমাকে দিলেন- আলাপ আরম্ভ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম-

আপনার নাম- শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাড়ী ঢাকা।

কোথায় যাবেন- আঠার বাড়ী।

কেন যাইতেছেন- আমি টেলিগ্রাম বিভাগের ইন্‌সপেক্টর, সেখানে ইন্‌সপেকশন আছে তাই যাইতেছি।

পকেটে তাহার চেন ঘড়ি ছিল, দেখিল প্রায় আটটা বিশ মিনিট হইয়াছে। এতৎ সঙ্গে পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানা টেলিগ্রামের মত কাগজ আমাকে দেখাইলেন। আমি ইংরেজি বেশী কিছুই জানিনা, কাগজখানার মধ্যে এইমাত্র পড়িলাম- এক ছত্তরে লিখা Athara Bari আঠার বাড়ী, তাহা দেখিয়াই এবং লোকটার হাবভাব ও ভঙ্গীতে বেশ বিশ্বাস জন্মিল, তাহাতে আমার সম্যক পরিচয় বলিলাম এবং যে কারণে বাহির হইয়াছি তাহা জানাইলাম। তাহাতে ঐ ভদ্রলোক আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বেশ আশা ভরশা দিতে লাগিল এবং বলিল- আমার এক খুড়া কুচবিহারের মহারাজার সুপারিটেনডেন্ট, আর এক ভাই ঢাকা সলিমুল্লা সাহেবের সরকারের নায়েব,

আর এক ভাই মুন্সেফ, এক খুড়া ও এক ভাই পাটের অফিসে সাহেবের বড় বাবু, তা বিনে অন্যান্য অনেক কারবারও আছে। যে কোন স্থানে আমাকে সুবিধা করিয়া দিবে। এমন অনেকেরই সে সুবিধা করিয়া দিয়াছে। সে নিজে একজন গ্রাজুয়েট- লুসাই যুদ্ধের সময় দেড়শত টাকা বেতনে টেলিগ্রাম ইনসপেক্টর ছিলেন। এখন নব্বই টাকা বেতনে ময়মনসিংহ ঢাকা ডিস্ট্রীক্টে চাকুরীতে আসে। সে আঠার বাড়ী যাবে, আমিও আঠার বাড়ীই যাব বলিলাম। তবে অদ্য শরীর বড় অসক্ত, কল্য যাইতে ইচ্ছা করি, তাহাতে ঐ ভদ্রলোকও হাঁপ ছাড়িয়া বলিল– বাস্তবিক আমিও বড় পরিশ্রম করিয়াছি, আমারও কল্য গেলেই হয়তঃ চলিবে। আচ্ছা আজ তবে রহিয়া গেলাম। কল্য সকালে চলুন দু'জনে একত্রে রওয়ানা হইব। কাজের জন্য কোন চিন্তা নাই তবে আঠার বাড়ী, আমার আবশ্যক আছে বলিয়া সঙ্গে যাবেন নতুবা আপনি থাকেন, আমি ফিরিবার কালে আপনাকে সঙ্গে নিব। আমি এমত সুযোগে কেন তার সঙ্গ ছাড়ি, কাজেই আঠার বাড়ী যাওয়া সাব্যস্থ হইল– মনে ভাবিলাম বামে শৃগাল দর্শন বড়ই শুভযোগ, ইহা বিফল হইতে পারে না– হয়তঃ আমার কপাল ফিরিল।

বিদেশীকে বিশ্বাস করিও না

সেদিন দু'জনে হোটেলেই রহিলাম, বিকালে বাজারে বাহির হইয়া কাচারীতে নায়েবের নিকট গেলাম কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধার আভাষ পাইলাম না। ফিরিয়া পোস্টাফিসে আসিয়া বাড়ীতে চিঠি দিলাম, হোটেলে আসিলাম। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া দু'জনে ঘুমাইলাম, সকালে জাগিয়া হাত মুখ ধুইয়া রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম। হোটেলের অধ্যক্ষ পয়সা চাহিল। পয়সা দিতে প্রস্তুত হইলাম, সঙ্গীয় ভদ্রলোক বলিলেন যে, মহাশয় ! আমার পয়সাও আপনি দিয়া ফেলুন, আমার নিকট এখন ভাঙ্গা পয়সা কি টাকাও নাই তবে নোট আছে,– এই বলিয়া পকেট হইতে একটা কাগজের পুলিন্দা বাহির করিয়া দেখাইলেন, আমিও মনে করিলাম হয়ত থাকিতে পারে। এই ভাবিয়া আমার তহবিল হইতেই পয়সা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আঠার বাড়ী রওয়ানা হইলাম।

বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় ঈশ্বরগঞ্জ গেলাম, সেখানে স্থানটি এত ডোবা যে, বাজারের দোকান ঘর পর্যন্ত বাঁশের মাচার উপর। ঈশ্বরগঞ্জ একটা সাবডিভিশন, সকল আমলাদের বাসাই সদর রাস্তার দুই পার্শ্বে, প্রচুর জল, কিন্তু- জল সরিবার কোনও নালা বা খাল নাই। বৃষ্টির জলে বিল ভরিলেই সেখানে আর জলের পচাঁ গন্ধে রাস্তা দিয়া চলা যায় না। সমগ্র ময়মনসিংহ শহরে মাত্র এক ব্রহ্মপুত্র নদ, আর কোন নদী নালা নাই, বড় বড় বিল আবদ্ধ, কাজেই কেবল নদীর তীরস্থ স্থানগুলি একটু পরিষ্কার এবং শুকনা, তদভিন্ন আর সকল স্থলই নিতান্ত কদর্য বটে। সেই ঈশ্বরগঞ্জে দু'পয়সার কলা কিনিয়া খাইলাম কিন্তু জল খাইবার স্থল নাই। একটা পুষ্করিণী দেখিলাম, ভাল জল মনে করিয়া

নিকটে গেলাম- যাইয়া দেখি তাহার পুঁতিগন্ধে বমি হয়, কজেই আর জল খাওয়া হইল না, দুজনে রওয়ানা হইলাম। মাঝে মাঝে সমতল মাঠ, মাঝে মাঝে অতি প্রকাণ্ড বিল, তাহার মধ্যে দিয়া সদর রাস্তা চলিয়াছে। কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার আছে, বাজারে প্রধান জিনিস পাঁচ সাত দশ ঘর বেশ্যা, বোধ হয় এত অধিক বার- বণিতা আর কোথাও নাই। চলিতে চলিতে বেলা এক প্রহর থাকিতে এক গ্রাম্য বাজারে যাইয়া কিছু চিড়া ও চিনি খরিদ করিয়া জল খাওয়া হইল। তাহার পয়সাও আমার তহবিল হইতেই দিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আঠার বাড়ি জমিদার বাড়ির নিকটে পঁহুছিলাম সেখানে অতিথিশালা আছে, যে কোন ব্যক্তি অতিথি থাকিতে পারে, তাই আমরাও যাইয়া আবেদন করিলাম। আমাদের জন্য ছোট একখানা ঘর, এক প্রস্থ বিছানা, বেগুন ও মশুরির ডাইল, কাঁচা লঙ্কা, ক খানা কাঠ, কিছু তৈল, একটি প্রদীপের মুছি, একখানা দায়ের ব্যবস্থাও হইল। হাত পা ধুইয়া সঙ্গীয় ভদ্রলোকই পাক চড়াইল, কেননা এ সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ- সে খুব চতুর। এদিকে রান্না প্রস্তুত হইতেছে আর আমার ভিতরেও জ্বালা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মনে নানা সন্দেহ উদয় হইল। একবার ঘর হইতে বাহির হইলাম, ঘোরতর অন্ধকার। মনে করিলাম পোষ্টঅফিসে কি টেলিগ্রাম অফিসে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি লোকটি কে ? বাস্তবিক আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিতে লাগিল যে, লোকটা নেহাত কোন জুয়াচোর, এদিকে তাহার প্ররোচনায় বিশেষ স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা, বামে শৃগাল দর্শন, অথচ ভদ্রলোকের মত ব্যবহার, বিষম এক সমস্যায় পতিত হইয়া মনের চিন্তা মনে রাখিয়াই নীরব রহিলাম এবং কোথাও আর যাওয়া হইল না। আহারের পর বিছানায় শুইলাম, সারাদিনের পরিশ্রমে প্রচুর নিদ্রা হইল। রাত্রি প্রভাতে জাগরিত হইয়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া কৃষ্ণদাস চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলাম। তাহাকে বলিলাম আপনার কাজ আপনি সারিয়া নেন- আমি ঘুরিয়া আসি, সে কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিল না। তাহার উদ্দেশ্য বুঝা নিতান্তই ভার হইল। সে বলিল- চলুন রামগোপালপুর যাব, তারপর আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়া আমার কাজ দেখিয়া লইব। এই কথায় আরও অবিশ্বাস আসিল, কিন্তু কথোপকথনে ও স্বার্থ চিন্তায় আবার আশ্বস্থ হইয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তিনি কাচারীর মসনদে বসিয়া আছেন, যাইয়া নমস্কার করিলাম ও পরিচয় দিলাম, তাহাতে গতরাত্রে অতিথিশালায় খাওয়াতে তিনি একটু বিরক্ত হইলেন ও নিতান্ত স্নেহের সহিত বলিলেন- এখন কাজের কোনও সুবিধা নাই, হয়তঃ পূর্বে চিঠি লিখিয়া আসিলেই ভাল হইত, তবে এখনও একটি কাজ দিতে পারি। কিন্তু অল্প বেতনে খোরাকী চলাও ভার হইবে, অতএব দিতে ইচ্ছা করি না। সময়ে অনুসন্ধান করিবে, এই কথা বলাতে মনে করিলাম যে, কাজ তো সঙ্গীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই দিবে, এখানে থাকার আবশ্যক কি ! এখন রামগোপালপুর প্রস্থান করাই ভাল। তাই নানা অজুহাতে বিদায় লইয়া

রামগোপালপুর অভিমুখে চলিলাম- রাস্তার দুই পার্শ্বে ভূমিকম্পের চিহ্ন, প্রকাণ্ড বিল, আর অতি বড় বড় জলৌকা সদর পথের কিনারা দিয়া হাটিয়া বেড়ায়, দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম। প্রায় অল্প বেলা থাকিতে রামগোপালপুর অতিথিশালায় আশ্রয় লইলাম। সেখানে রান্না করার ব্রাহ্মণ আছে কাজেই এত পরিশ্রমের পর রান্না ভাত পাইয়া খুব আনন্দ হইল, রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পর ডাল-ভাত উদরস্থ করিয়া নিদ্রা গেলাম। পরের দিন শরীর বড়ই অবসন্ন কাজেই দুই প্রহরেও সেখানেই আহার করিলাম,- বিকালে সঙ্গীয় ব্যক্তি বলিলেন- চলুন গৌরীপুর, কালীকা পুর দেখিয়া যাই। সে জায়গা এখান হইতে মাত্র পাঁচ ছয় মাইল দূরে। তাহার কথায় রাজী হইয়া রওয়ানা হইলাম, গৌরীপুর যাইয়া কতক্ষণ বেড়াইয়া ভূমিকম্পের চিহ্ন রাশি রাশি ইষ্টক স্তূপ দেখিয়া সন্ধ্যার সময় কালীকাপুর অতিথিশালায় আশ্রয় লইলাম। একখানা ভাঙ্গা টীনের ঘর সম্মুখে বৃহৎ জঙ্গল,- তিনি আমাকে সেখানে বসাইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, একা একা বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, প্রায় এক ঘণ্টা পর সহচর আসিল, কিছু খেসারী ডাল, কাঁচা মরিচ ও চাউল আসিল। রান্না বসান হইল, ঘরখানা নিতান্ত পুঁতিগন্ধময় অপরিষ্কার। ডাল বসাইয়া দিয়া সহচর আবার কোথায় গেল, একটু পর আসিয়া ডালের অবস্থা দেখিয়া বড় বিরক্ত হইল, তাহার পর যা হউক একটা বন্দোবস্ত হইল, কোনও মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম। শয়নের ব্যবস্থাও অতি কদর্য্য, শুইলাম- বড় গরম পড়িয়াছে। কাজেই সহচর আমায় সে ঘরে একা ফেলিয়াই আবার কোথায় গেল। ঘরের দরজা জানালাও ভাঙ্গা, কোনও মতে টানিয়া নানা আশঙ্কাতে চক্ষু মুদিয়া একা ঘরে 'দয়াময়ের' শ্রীপদ ভাবিতেছি। সারাদিনের পরিশ্রমে খুব নিদ্রা আসিয়াছে, কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, মনেও নাই। ইত্যবসরে ঐ ভদ্রলোক হাকডাক করিয়া আসিয়া ঘরে উপস্থিত হইল। চমকিয়া হঠাৎ জাগরিত হইলাম- ব্যাপারখানা কি ? তিনি বলিলেন- আমি দেখিলাম ঘর হইতে একটি নেকড়ে বাঘ কি জানি কামড় দিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, মহাশয় আপনি এত বেঁহুস, আজ তো আপনি প্রাণেই মারা যাইতেন। এই কথার পরই চেয়ে দেখি আমার বস্তাখানা নাই- বুক দুর দুর কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, কারণ আমার এই জীবনের লক্ষ্যমূলে রওয়ানা হইয়া যে সকল আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইয়া শান্তি পাইয়াছি, সেই সকল লিখিত বহিগুলি সবই আমার সঙ্গে ছিল, কেন না বাড়িতে রাখিয়া যাই নাই, যদি পিতা মাতা কি অন্য কেহ আমার মন পরিবর্তনের জন্য সেই বহিগুলি কোথাও ফেলিয়া দেয়, কি যত্নের অভাবে নষ্ট হয়, কি চোরে নেয়, কি আগুনে পোড়া যায়, তবে আমার হৃদয়সর্বস্ব হারাইয়া নিশ্চয়ই বাঁচিব না কিংবা পাগল হইব। কাজেই এত দীর্ঘ পথেও সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছি। এতদিরিক্ত একখানা কাপড়, একটা সার্ট, একখানা চাদর ও মাত্র একটি টাকা আছে। কালীকচ্ছ হইতে আসিবার কালে পুজ্যপাদ মহেন্দ্রবাবুর লোহার কারখানায় তৈরী অতি সুন্দর একটি ছুরি নীলুবাবু অর্থাৎ পুজ্যপাদ মহেন্দ্রবাবুর চতুর্থ পুত্রের নিকট হইতে চাহিয়া

আনিয়া ছিলাম। সেখানাও সঙ্গে ছিল। এইসব জিনিস হারাইয়া একেবারে দিকবিদিক ভাবনাশূন্য হইয়া, কিম্ভুৎ কিমাকার অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া হা হুতাস করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইলাম। পনের বিশ পদ অগ্রসর হইয়াই দেখি সেই অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলের ধারে সাফ কাপড়ের মত দেখা যায় তখন আর প্রাণের ভয় নাই, দৌড়াইয়া যাইয়া ধরিলাম। চেয়ে দেখি আমার সর্বস্ব-ই রহিয়াছে। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ঘরে আসিয়া বস্তাখানা কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলাম ও অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর সামান্য তন্দ্রার মত নিদ্রাবেশ হইয়া পুনঃ পুনঃ জাগরিত হইতে লাগিলাম, এইভাবে রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাণে একটু বল আসিল, আমার একান্ত ইচ্ছা ছুটিয়া পালাই, কিন্তু সহচরের শৈথিল্যতায় দ্বিপ্রহরেও সেখানে আহার করিয়া রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় আবার রামগোপালপুর আসিয়া অতিথি হইলাম। সেখানকার অতিথিশালার অধ্যক্ষের একটি ছেলে ছিল, সে ইংরেজি স্কুলে পড়িত, তাহার নিকট সহচর জানাইল যে, তিনি টেলিগ্রাম ইনস্পেক্টর। কোনও কার্য্যেপলক্ষে সেখানে আসিয়াছেন। বিশেষতঃ সে উচ্চ বংশজ ও গ্রাজুয়েট। ছেলেটি এই কথা জমিদার বাড়িতে জানাইল, তাহাতে আহারের জন্য ময়দা ঘি প্রভৃতির বন্দোবস্ত এবং শয়নের জন্য উত্তম লেপ তোষকের বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। রাত্রিতে রুটি তৈয়ার হইলে খুব বিশিষ্ট রকম আহার করিয়া পরমানন্দে ঘুম দিলাম- কিন্তু হৃদয়ে বেশ একটু সন্দেহও চাপা আছে। বিশেষের পর অবিশেষ এবং অবিশেষের পর বিশেষ অবশ্যম্ভাবী নির্দ্দিষ্ট ব্যাপার।

রাত্রি প্রভাত হইল উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বসিলাম, সহচর বলিলেন- চলুন অদ্য এখানেই বিশ্রাম করি। কল্য সকালে উঠিয়া শেরপুর যাইব এবং তথা হইতে গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ঢাকা যাইব, সেখানে যাইয়াই আপনার কাজের সুবিধা করিয়া দিব। এখানে টেলিগ্রাম মাষ্টারের সাথে কিছু আলাপ আলোচনা আছে, তাহা অদ্য শেষ করিয়া নেই,- রামগোপালপুর অতিথিশালার অনতি দূরেই টেলিগ্রাম অফিস বর্তমান।

সহচরের এই সকল কথাতে মনে প্রবোধ পাইয়া স্বীকৃত হইলাম। আহারের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল, সহচর কতক সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর আহার করিয়া বিছানায় পড়িয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘন্টা পরে সহচর বলিলেন আমি এখানকার জমিদার বা রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমার মাত্র এক প্রস্থ কাপড়, সব ময়লা হইয়া গিয়াছে। আপনার পরিষ্কার কাপড় জামা ও চাদর আমাকে দেন, আমি ঘুরিয়া আসি। এই কথার উপর তাহাকে বস্ত্রাদি দিলাম, তিনি বাবু সাজিয়া চেইন ঘড়ি লটকাইয়া, টেড়ি কাটিয়া, রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। আমি শুইয়া শুইয়া তন্দ্রার কোলে চিন্তা সহচরী লইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

সঙ্কট মুহূর্তে গুরুদেবের দৈববাণী

প্রথম তন্দ্রাতেই চেয়ে দেখি অপূর্ব জ্যোতি- মণ্ডল, তাহার মধ্যে গুরুদেব স্বামীজী - আরক্ত লোচনে দণ্ডায়মান হইয়া তীব্র ভাষায় বলিয়া উঠিলেন "কাপুরুষ শীঘ্র চলিয়া যাও" হঠাৎ চমকিত হইয়া জাগরিত হইলাম, ভাবিলাম ব্যাপারখানা কি, প্রাণের সন্দেহ অধিকতর ভাবে বৃদ্ধি হইয়া বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মনে ভাবিলাম ছুটিয়া যাই। এদিকে কাপড়গুলি সে নিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ স্বার্থ চিন্তার মোহে অভিভূত। আবার ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইলাম- আবার জ্যোতিমণ্ডল, একখানা পুস্তক লইয়া অলক্ষ্যে গুরুদেব দণ্ডায়মান। সেই পুস্তকখানার কভারিং এর উপর অতি বড় বড় অক্ষরে লিখা "কাপুরুষ এখনও রহিলে- চলিয়া যাও"।

পুলিশ ইন্সপেক্টরের হাতে পতিত ও লাঞ্ছনা

আবার চমকিত হইয়া জাগরিত হইলাম। আকাশ পাতাল কত কিছু ভাবিতে ভাবিতে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্যায় পড়িয়া অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। এমন সময় একজন সাব ইনসপেক্টর, একজন কনেস্টবল ও দুইজন চৌকিদার উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল- টেলীগ্রাম ইনসপেক্টরের সঙ্গে তুমি আসিয়াছ ? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, পথে দেখা হইয়া এখানে আসিয়াছি। অমনি এক ব্যক্তি আমার হাত ধরিতে অগ্রসর হইল, আমি বস্তা বগলে করিয়া চৌকি হইতে নামিলাম। আদ্যোপান্ত বিবেকের নিষেধ, গুরুদেবের আজ্ঞা সকল যুগপৎ ক্ষণিকের মধ্যে হৃদয়ে আসিয়া আলোড়িত হইয়া স্তম্ভিত, কাষ্ঠ পুত্তলীর ন্যায় হইলাম, পুলিশ বলিল- চল।

আমি- কোথায় যাইব

পুলিশ- কোর্টে

আমি- কেন ?

পুলিশ- কেন আবার কি ? বাবু জোয়াচুরি কোরে কোরে দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ, সঙ্গী তো ধরা পড়েছে, আর তুমি বাকি থাকিবে কেন ?

আমি- ব্যাপারখানা কি, আমি তো কিছু জানি না।

পুলিশ- চল এখনই জানতে পারবে। এই কথার পর তাহারা লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারার ন্যায় রওয়ানা হইলাম। সম্মুখে বার-দোয়ারি অতিশয় প্রকাণ্ডদালান, প্রবেশ করিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি সম্মুখেই আমার সহচর অধোমুখে গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া আছেন। চারিদিকে অগণিত জনসমষ্টি, রাজা, রাজার দুই পুত্র

কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশের লোক, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট আরও অনেক দর্শকবৃন্দসহ সকলে মজলিশ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া সহচরের পার্শ্বেই বসিলাম। প্রশ্ন আরম্ভ হইল- তোমার নাম কি ?

আমি- শ্রী মনোমোহন দত্ত-

প্রশ্ন- বাড়ি কোথায় ?

আমি- ত্রিপুরা জিলার সাতমোড়া গ্রামে।

প্রশ্ন- এদিকে কেন আসিয়াছ ?

আমি- উমেদারীতে চাকরির অনুসন্ধানে।

সমবেত লোক- বেশ বেশ জুয়াচুরীটা বেশ সুন্দর উমেদারীর পসার।

প্রশ্ন- তাহাকে তুমি চেন ?

আমি- হ্যাঁ, এক রকম চিনি- তাহার সঙ্গে হোসেনপুর হোটেলে আমার দেখা। এই কথার পর আনুপূর্বিক সকল ইতিবৃত্ত বলিয়া আমার কাপড় চাদর জামা টানিয়া খসাইয়া লইলাম, সেও নির্বিবাদে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর নানা রকম ঠাট্টা চাতুরি চলিতে লাগিল এবং আমাদিগকে হাজতে রাখিবার বন্দোবস্ত হইল ও আমার বস্তা তালাস করিবার হুকুম হইল। আমি অতিমাত্র চঞ্চল হইলাম কেননা একখানা ধারাল ছুরি বস্তাতে রহিয়াছে, কাজেই কথাচ্ছলে ঐ ছুরিখানা টানিয়া বাহির করিয়া পার্শ্ব চৌকির নীচে রাখিয়া বস্তা নিজেই দেখাইলাম। সকলে যদিচ্ছা আলোচনা দ্বারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ দ্বারা যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত করিল।

কেহ বলিতেছে- বেশ তো বাবু পসার খুব চলিয়াছে- না ?

কেহ বলিল- ভারী চতুর।

কেহ বলিল- ঢাকাতে বুঝি আর পসার চলে না ইত্যাদি কথোপকথন হইতে লাগিল, আমার কথা সত্য হইলেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। কি করিব- ভাবিয়া অস্থির, কেবল নাম লইতেছি আর অভয়পদ ভাবিয়া গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘনজনিত অপরাধ মার্জনা চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হঠাৎ ভয়ঙ্কর তেজে হৃদয় মাতিয়া উঠিল, সভামণ্ডপে আর আমি মানুষ দেখি না। মহাবলে বলীয়ান হইলাম- বাক্যস্ফূর্তি হইল, প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত কাহারও মুখে সাড়াশব্দ নাই। অভিভূত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আর অবিরাম আমার মুখ হইতে নানা বিধ বক্তৃতা বাহির হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কাহারও বাঙ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই- ঘণ্টাখানেক পর আপনা হইতেই কিছু নিস্তেজ হইয়া সকলের মুখ পানে চাহিলাম তাহাতে ঐ সমবেত সভ্য মণ্ডলী দুই পক্ষ হইয়া গেল। এক পক্ষ বলিতেছেন- সে নিতান্ত বিশিষ্ট কোনও বড় ভদ্র পরিবারের তেজস্বী ছেলে, কোনও কারণে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া এই দুষ্ট লোকের সঙ্গে পড়িয়াছে নতুবা এত নির্ভীকতা এবং এরূপ তীব্র ভাষা প্রয়োগ করা অপরাধীর সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার প্রমাণ- ঐ লোকটা একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, বাক্যস্ফূর্তি মাত্র হইতেছে না।

দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছে- না তা নয়, সে-ই দলের নেতা, অতি বিচক্ষণ চতুর, এতগুলো লোক তাহার চক্ষে ঠেকে না কেমন নির্ভীক নিরপরাধির ন্যায় কথা বলিতেছে। এই প্রকার আন্দোলন হইতে হইতে পরে সাব্যস্থ হইল যে সে-ই অপরাধী তাহার চালান হইবে ও হাজতে থাকিবে, আমি তাহার সাক্ষ্য দিব। আমাকে অতিথিশালায় থাকিতে হইবে। এই সমস্ত শুনিয়া মনে করিলাম যাহা হউক কতকটা রক্ষা পাইলাম- অমনি সভা ভঙ্গ হইল। আমাকে লইয়া দুই তিনটি ভদ্রলোক অতিথিশালায় আসিলেন ও সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

ইতঃস্তত ঃ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের হাপ ছাড়িয়া একটু বসিয়াছি, হয়ত দশ পনের মিনিট অতীত হইয়াছে, এমন সময় আবার একটি ভদ্রলোক ও দুই জন চৌকিদার উপস্থিত, বলিতেছেন- তোমাকে এই অবস্থায় রাখা যায় না। বিশেষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত হাজতেই থাকিতে হইবে।

মাথা মুণ্ড- আবার অধীর হইলাম, তাহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, পার্শ্বেই বড় একটি মহাজনের দোকান ঘর সেই ঘরে কেরাসিনের বাক্সের উপর গদিতে আমি বসিলাম, ভদ্রলোকটি চেয়ারের উপর বসিয়া অতি তীব্রভাবে শ্লেষ করিতে লাগিলেন। বলিলেন- এটাই প্রকৃত জুরাচোর, আর ঐটা পাগল।

আমি বলিলাম কেমনে জানিলেন। ভদ্রলোকটি অতিমাত্র মুখ বিকৃত করিয়া বিকট স্বরে বলিয়া উঠিলেন- চুলোয় থেকে জেনেছি, বদমায়েস- আবার মুখের উপর কথা বলে। মেজাজ দেখিয়া অনুমান হইল, বাবুটি ভারী চটা লোক, পাছে আবার খানা তল্লাস করে এই ভয়, কেন না বলিতে ভুলিয়াছি যে, ছুরিখানার মায়া ছাড়াইতে পারি নাই। বারোদোয়ারী দালানে চৌকির নীচে রাখিয়াছিলাম, আসিবার সময় আবার বস্তায় বান্ধিয়া আনিয়াছি। সেখানা সঙ্গেই আছে, কাজেই প্রস্রাবের অজুহাতে ঘরের পিছনে যাইয়া ছুরিখানা কচুবনে উড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া বসিলাম। আরও দুই একটি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ এবং দোকানদার তথায় সমাগত হইল। একথা সে কথার পর ঐ চটা মেজাজের অভদ্রের ন্যায় আচার বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি কোথায় চলিয়া গেলেন। সেখানে অন্যান্যেরা আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা ও আন্দোলন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বাবু আর আসেন না। তখন অন্য একটি ভদ্রলোক আমাকে অতিথিশালায় শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আসিলেন ও বলিলেন- মহাশয় ! আমি সব বুঝিয়াছি,

আপনি ভদ্রলোকের সন্তান, বিদেশে উমেদারীতে আসিয়াছেন। এবারে আপনার যাত্রা ভাল হয় নাই, বাড়ি চলিয়া যান। এদেশে চাকরি করিবার ইচ্ছা থাকিলে সময়ে আসিবেন। তখন ঐ হোটেলের অধ্যক্ষের ছেলেটিও কাছে ছিল, সে বলিল-মহাশয় ! আপনার বিপদে আমি বড়ই দুঃখিত ইইলাম, কেননা ঐ লোকটা আমার নিকট ইংরেজিতে অনেক বাচালতা করিয়াছে এবং আপনাকে তাহার ভৃত্য বলিয়া জানাইয়াছে। আমি বলিলাম- কি মতে সে ধরা পড়িল আপনি জানেন ?

সে বলিল- হ্যাঁ জানি, শুনুন-

বিকালে রাজাবাবুর দরবারে সে যায়, তখন রাজাবাবুর মধ্যম ছেলে নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। সে গিয়া টেলিগ্রাম ইনসপেক্টর বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ঢাকা বড় পরিবারের লোক বলিয়া জানায় ও ঢাকাতে কোনও এন্ট্রান্স স্কুল করিবার জন্য সাহায্যার্থে তাহারা অনেকে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেও একজন বলিয়া বলে ও কিছু সাহায্য চায়। গ্রাজুয়েট ও সম্মানিত লোক বলিয়া সাহায্য দিতে স্বীকার করেন। ইত্যবসরে রাজাবাবুর মধ্যম ছেলেটি পদচারণা করিতে করিতে টেলিগ্রাম অফিসের নিকটে আসেন ও টেলিগ্রাম মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন গল্পচ্ছলে টেলিগ্রাম মাষ্টারকে মধ্যম বাবু বলেন- কি গো মশায় আপনাদের ইনসপেক্টর আজ এসেছেন কি ?

মাষ্টার- না, ইনসপেক্টর তো আসে নাই।

বাবু- বলেন কি! এইত আমাদের কাচারী ঘরে বাবার নিকট আলাপ করছেন।

মাষ্টার- নাম কি ?

বাবু- শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মাষ্টার- না, আমাদের ইনসপেক্টরের এই নাম নয়।

বাবু- তবে তিনি কে ?

মাষ্টার- জানি না।

বাবু- হয়তঃ পরিবর্তন হয়ে নতুন আসতে পারে, আচ্ছা তবে জানুন না কেন, চলুন অফিসে যাই।

এই কথার পর বড়ই কৌতুহল পরবশ হইয়া বাবু এবং মাষ্টার অফিসে যাইয়া সদর অফিসে টেলি করিলেন সেখানকার ইনসপেক্টর কে এবং শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে কোনও ইনসপেক্টর আছে কি না ?

উত্তরে জানিতে পারিলেন সব মিথ্যা। তখনই বাবু সন্দেহ করিয়া পুলিশ আনাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন ও জিজ্ঞাসা করেন- তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে, তাহাতে সে আপনার কথা বলে।

ঘটনা শুনিয়া আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম ও আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত আরও অনেক কথা ঐ বাবুটি ও ছেলেটির নিকট বলিলাম! বাস্তবিক তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, আপনি অল্প রাত্রি থাকিতে এখান হইতে চলিয়া যান- সদর রাস্তা আছে কোনও ভয় নাই, কেননা কোনও রকম গোলমালে পড়িলেই অযথা কষ্ট পাইবেন, অতএব এই পরামর্শই ভাল।

আমি বলিলাম- তাহাতে বরং অধিকতর দোষী হইব ও পরে আবার গ্রেপ্তার হইতে পারি। যা হয় একেবারেই হয়ে যাক।

তাহারা বলিল- কি আর হবে, যা হবার হয়ে গেছে ইত্যাদি অনেকে কথাতে আমাকে সাহস দিল এবং রাস্তায় ব্রহ্মপুত্র পার হইবার জন্য ছেলেটি দু'টি পয়সা দিল। আমার হাতে মাত্র একটি টাকা আছে,- পয়সা যাহা ছিল প্রাণবন্ধুর কল্যাণে বড় চাকরির আশায় খরচ করিয়া ভিখারী হইয়াছি।

ইত্যাদি কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি প্রায় দুইটা, তাহারা আমাকে একটু ঘুমাইতে বলিয়া যার যার বাসস্থানে চলিয়া গেল। আমিও ভাবনার ঘোরে বিভোর হইয়া একটু নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড থাকিতে জাগরিত হইলাম। তল্পী-তল্পা গুছাইয়া লইলাম, রওয়ানা হইব মনে করিয়া আরও প্রায় আধ ঘন্টা কাটাইলাম, তারপর উঠিয়া চলিলাম।

মায়ার টান

কিছুদূর যাইয়াই ছুরিখানার জন্য মন বড় অধীর হইল, ফিরিয়া আসিয়া যেখানে ফেলিয়া ছিলাম তালাস করিয়া দেখিলাম, পাইলাম না, ইহারই মধ্যে দোকানের লোক জাগরিত হইল। সকল ভয় পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে দোকানের গোমস্তা বলিল- ছুরিখানা আমাদের মহাজন পাইয়াছে কিন্তু তাহার বাড়ি এখান হইতে দেড় মাইল দূরে। অমনি তাহার বাড়ির দিকে ছুটিয়া প্রায় অর্দ্ধ পথে আসিয়াছি এমন সময় মহাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, পূর্ব রাত্রির পরিচয় ছিল। ছুরিটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল- হ্যাঁ পাইয়াছি কিন্তু দোকানে রহিয়াছে। আবার তাহার সঙ্গে দোকানে আসিলাম, সে সততার সহিতই ছুরিখানা দিল, তখন দু'চারজন লোক বাহির হইয়াছে। তাড়াতাড়ি অমিত বলের সহিত দৌড়াইলাম। প্রায় তিন চার মাইল আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলাম এবং পরে নির্ভর অন্তঃকরণে হাটিতে লাগিলাম।

বাড়ি অভিমুখে যাত্রা ও পথে দুর্ভোগ

যখন নাছিরাবাদের নিকট ব্রহ্মপুত্রের পারে আসিয়াছি তখন বেলা আড়াই প্রহর হইয়াছে। নদী পার হইয়া এক দোকানে বসিয়া তামাক খাইলাম। হাতে মাত্র একটি টাকা আছে, হিসাব করিয়া দেখিলাম তথা হইতে নারায়ণগঞ্জের ভাড়া হয় না। কাজেই আবার চলিলাম। প্রায় চারি দণ্ড বেলা থাকিতে সেনহাটি ষ্টেশন হইতে চার পাঁচ মাইল উত্তরে অর্থাৎ দূরে রহিয়াছি। আর পা চলে না, শরীর অবসন্ন, ক্ষুধায় অধীর, কি করিব- সদর রেলওয়ের রাস্তার ধারে জঙ্গলের কিনারে একটা গাছের ধারে বসিয়া পড়িলাম।

বসিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতেছি- চেয়ে দেখি অদূরে জঙ্গলের মধ্যে একখানা কুটি দেখা যায়, ধীরে ধীরে তথায় অগ্রসর হইলাম। যেয়ে দেখি অতি ক্ষুদ্র একখানা দোকান ঘর, পার্শ্বে একটি বার চৌদ্দ বৎসরের ছেলে দণ্ডায়মান। সেখানে বসিয়া তামাক খাইতে চাহিলাম। ছেলেটি আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল- আপনার নাম-

আমি- শ্রী মনোমোহন দত্ত

কোথা হইতে আসিলেন- রামগোপালপুর হইতে।

সে বিস্মিত হইয়া বলিল- বলেন কি ?

এখান হইতে রামগোপালপুর ছয়ত্রিশ সাঁয়ত্রিশ মাইল হইবে।

কখন রওয়ানা হইয়াছেন ?

আমি- প্রাতে।

ছেলে- আপনাকে এত বিমর্ষ দেখা যায় কেন ? সারাদিন যেন খান নাই।

আমি- না, খাওয়া ঘটে নাই।

ছেলে- কেন? বিষয় কি ?

আমি- আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করিলাম। ছেলেটি এন্ট্রান্স স্কুলে দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে, জাতিতে বারুই, অদূরে রেলওয়ে রাস্তার অপর পার্শ্বে তাহার বাড়ি। সে আমার দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইল এবং নিতান্ত আগ্রহের সহিত আমাকে তাহার বাড়িতে লইয়া চলিল। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি সাতুয়াই ছিল। বাড়িতে দধি দুগ্ধের অভাব কিছুই নাই, আহার করিলাম। সেও অতিমাত্র যত্ন সহকারে আমার শুশ্রূষা করিয়া পান তামাক দিল, চৌকির উপর বিছানা পাতিয়া দিল। কিন্তু আমার আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না, জিজ্ঞাসা করিলাম- এখান হইতে সামনের ষ্টেশন কতদূর, সে বলিল- হয়তঃ তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল হইবে।

সঙ্গে একটা টাকা ছিল। মনে করিলাম এক টাকা ভাড়াতে যতদূর যাইতে পারি যাইব পরে আবার হাটিয়া চলিব, তারপর জগৎ পিতা দয়াময় যাহা করেন।

এই বলিয়া ছেলেটির অনুরোধ সত্বেও তথা হাইতে উঠিয়া রওয়ানা হইলাম। তখন হয়ত বেলা দুই দণ্ড আছে। মনে করিলাম তিন মাইল যাইতে আর কত সময় লাগিবে। কতদূর আসিয়াছি পরই সন্ধ্যার অন্ধকার দেখা দিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে ভয়ানক জঙ্গল, মনে কিছু ভয় হইল, আবার সেখানে বাঘও আছে বলিয়া শুনিয়াছি। কি করিব- ভয়ে ভয়ে কেবল অকুল কাণ্ডারীর অভয় পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া চলিলাম। একটু যাইয়াই একটি পথিকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে পোষ্টাফিসের পিয়ন, গ্রামে চিঠি বিলি করিতে আসিয়াছিল। এখন সম্মুখের ষ্টেশনেই যাইবে। তাহাকে পাইয়া মনে খুব বল হইল, দ্রুতবেগে ছুটিলাম। প্রায় ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইয়াছি রাত্রিও হয়ত দুই তিন দণ্ড হইয়াছে, এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলাম- ষ্টেশনের নাম কি ?

পিয়ন- সেনহাটি।

নামটি শুনিয়া হৃদয়ে যুগপৎ এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। এক সেনহাটিতে গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য আমার ধর্মবন্ধু বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারী করেন এবং সপরিবারে সেখানে থাকেন। কাজেই পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিলাম- এখানে ললিত বাবু নামে কোনও ব্রাহ্মণ ডাক্তার আছেন কি ?

পিয়ন- আছে।

আমি- তিনি ধর্ম চর্চা করেন ?

পিয়ন- হ্যাঁ, দয়াময়ের নাম বলেন।

আমি- খুব বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ ?

পিয়ন- হ্যাঁ।

আমি- ছেলের নাম ত্রৈলোক্য সেও ডাক্তারী করে।

পিয়ন- হ্যাঁ।

এই কথা শুনিয়া যেন প্রাণের সকল অবসাদ দূর হইয়া গেল। বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম- ষ্টেশন হইতে বাসা কতদূর।

পিয়ন- অল্প, আধ-পোয়া মাইল হইবে।

আমি- যাইবার ভাল রাস্তা আছে কি ?

পিয়ন- আছে।

আমি- আমাকে পথ দেখাইয়ে দিবেন কি ?

পিয়ন- আমি আপনাকে লইয়াই যাইতাম, কিন্তু আমার অনেক কাজ আছে তাই পারিব না, তবে পথ দেখাইয়া দিব। বড় জঙ্গল, রাস্তায় বাঘের ভয় আছে- খুব সাবধানে যাবেন।

এই কথা বলিতে বলিতে ষ্টেশনে পঁহুছিলাম, একটু বসিলাম। অমনি পিয়ন আমাকে লইয়া পথ ধরাইয়া দিলেন। ঘোরতর অন্ধকার, রাস্তায় লোকজনের সাড়া শব্দটিও নাই। কেবল অভয়পদ ভরসা করিয়া জঙ্গলের ভিতরে ঢুকিলাম। অল্প কতটুকু যাইয়াই আর পথ পাই না, কি করিব, এদিকে বনে যেন নড়িতেছে শুনিতে পাই। মনে ভাবিলাম বুঝি জীবন লীলা শেষ হইবে, আবার সাহসের সহিত উঠিলাম- দেখি অদূরে একটি প্রদীপের আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে, কাজেই সে দিকে পথের অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু পথ না পাইয়া কতদূর আসিয়াই ভয়ানক উতলা ও কর্দ্দমপূর্ণ জলভূমিতে নামিয়া পড়িলাম। হায় কি করি- সম্মুখে বৃহৎ জলা, ডাকিতে লাগিলাম- কাহারও সাড়া শব্দ নাই, তখন কি করিব আবার ইতস্ততঃ করিয়া সেই জলার রাস্তা ধরিয়া প্রায় অনেকদূর অগ্রসর হইলাম। কোথায় কোন দিকে যাই সাব্যস্থ নাই, কেবল চলিতেছি। কতকদূর যাইয়া দেখি সম্মুখে একখানা ছোট পুকুর, চতুর্পার্শ্বে জলা। পুষ্করিণীর অপর পারে বাতির আলো দেখা যায়, তাই সেই আলো লক্ষ্যে পুকুরের পাড় ধরিয়া চলিলাম। কিন্তু একটু যাইয়াই জলাতে অনেকদূর পর্যন্ত পা বসিয়া গেল। কি বিপদ, কি করিব- আবার দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া এদিক সেদিক চলিতে লাগিলাম। অতিক্ষুদ্র একটি কলা গাছে বাঁধা আইলের মত দৃষ্টিতে পড়িল। তাহার উপর দিয়া চলিলাম, যাইয়া দেখি একখানা বাঁসের সাঁকো, মাত্র একটি বাঁশ দ্বারাই সাঁকোখানা তৈয়ার, তাও আবার ভাঙ্গা, নীচে ভয়ানক কাদা অথচ সাঁকোর দুই ধারে ধরিবার বিশেষ কোনও জিনিস নাই, এক পার্শ্বে একটি মূলী বাঁস হেলিয়া রহিয়াছে। সাহসের সহিত শ্রী গুরুদেবের অভয় পাদপদ্ম নির্ভর করিয়া তাহার উপরে চড়িলাম। ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়া কোনও মতে যেন ভগবানের দয়ার আনুকুল্যে সাঁকোখানা পার হইলাম। সম্মুখে অপ্রশস্ত বাঁধা রাস্তা, একটু যাইয়াই একখানা বাড়ি। বাড়ির পার্শ্বে যাইয়াই সেই ললিত বাবুর পরিচিত স্বর কানে বাজিল। প্রাণ চমকিয়া উঠিল, সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম এ বাসায় কে আছেন।

দুই তিনবার ডাকিবার পর উত্তর হইল কেন ?

আমি আছি- তুমি কে ?

আমি- আমার বাড়ি ত্রিপুরা জেলায়।

প্রশ্ন- নাম কি ? কাকে চাও ?

আমি- নাম মনোমেহন দত্ত, ললিত বাবু ডাক্তারকে খুঁজিতেছি।

যেই এই কথা বলা অমনি তিনি ধা করিয়া অতি দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই অন্ধকারেই আমার সহিত পরিচয় হইল। তিনিও চিনিতে পারিয়া একেবারে সাপটিয়ে ধরিয়া ঘরে নিয়া মাচার উপর বসাইয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন- কোথা হতে আসিলে।

আমি- রামগোপালপুর হইতে।

বন্ধু- বল কি? রামগোপালপুর তো এখান হতে চল্লিশ মাইল।

চল্লিশ মাইল কি একদিনে আসা যায়- ব্যাপার কি ?

তোমার নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই। এই কথা বলিয়াই বাড়ির ভিতরে গেলেন এবং এক বাটি দুধ ও সবরি কলা ও কাঁঠাল নিয়া আসিলেন এবং অন্য কথা কহিতে না দিয়া আহার করাইতে বসাইলেন, খুব পেট ভরিয়া খাইলাম।

তারপর আহারান্তে বন্ধুবর ও তাহার ছেলেটি আমাকে লইয়া বসিয়া আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং নানাবিধ উপদেশ ও সৎ কথা সদালাপে মনে আনন্দ প্রদান করিলেন। রাত্রিতে আবার রান্না হইল, অনুরোধে সামান্য মাত্র আহার করিয়া অবসাদে আনন্দে নিদ্রিত হইলাম।

রাত্রি প্রভাতে জাগরিত হইয়া রওয়ানা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না। দুই তিন দিন খুব আনন্দে আহার বিহারে দিন কাটাইয়া দিলাম, তারপর আর অধিক বিলম্ব করা বিধেয় নয় বিবেচনায়, বন্ধুবরকে জানাইলাম, তিনি দুইটি টাকা আমাকে রাস্তা খরচ বাবত দিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। নারায়ণগঞ্জের টিকিট করা হইল। দুই প্রহরের সময় নারায়ণগঞ্জে আসিয়া হোটেলে আহার করিলাম ও পরে কিছু মালদহ আম খরিদ করিয়া লইয়া গয়না নৌকাতে চড়িয়া বাড়িতে আসিলাম।

বাড়িতে প্রত্যাবর্তন- সাংসারিক কষ্ট

বাড়িতে সবাইকে আনুপূর্বিক ঘটনা জানাইলাম। সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইল। দুই প্রহরের সময়ে বাড়িতে আসিয়া ছিলাম। বিকাল বেলায় আমার একমাত্র আরামের স্থল গোপালসাধুর আখড়ায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। পূর্বে যাহাকে পাগল হইবে বলিয়াছিলাম রাস্তাতেই তাহাদের বাড়ি। বাস্তবিকই আমি বাড়ি হইতে রওয়ানা হইয়া যাইবার অল্পকাল পরেই সে পাগল হইয়াছে,- কেবল দয়াময়ের নাম বলে ও নানা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করে, কোনও কাজকর্ম করে না, কেহ কিছু বলিলে অতিমাত্র উত্তেজিত হয়, একঘরে বসিয়া থাকে এবং পাগল হইয়াই শ্রীরামপুর রামদয়াল সাধুর বাড়ি যাইয়া তাহার নিকট হইতে নাম গ্রহণ করিয়া সেই নামাদি জপ ও ধ্যান করে।

আমি ঐ কথা বলিয়া গিয়াছি সত্য কিন্তু কিছুমাত্র মনে নাই। যেই তাহার বাড়ির উঠানে গিয়াছি অমনি সে আমাকে দেখিয়া লাফ ও চীৎকার দিয়া মাটিতে লম্বা হইয়া পড়িয়া ধরফড় করিতে লাগিল। আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ধরিয়া উঠাইলাম ও কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে বৈশাখ মাসে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ পাগল হইয়াছে।

অমনি তাহার ঘরে যাইয়া বসিলাম ও তাহাকে সাধ্যানুরূপ সান্ত্বনা দিলাম ও পরে আখড়ায় যাইয়া নানাবিধ কথোপকথনে আনন্দিত হইয়া বাড়ি আসিলাম। গুরুদয়াল উত্তরোত্তর ঈশ্বরীয়- ভাবে আবিষ্ট হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল ও প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসিয়া বলিতে লাগিল যে, এই বাড়িতে "দয়াময়ের একটি শিকড় আছে," কেউ চিনে না কেউ জান না, শিকড় আছে, শিকড় আছে, দেখিতে পাইবে, দেখবে,- আমি কি সাধে পাগল হইয়াছি, এই সমস্ত কথা বলিয়া নৃত্য করিত ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অহর্নিশ থাকিত। অন্য কাহারও কথা কিছুমাত্র শুনিত না, কেবল আমার আদেশ রক্ষা করিত ও মাঝে মাঝে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া আবিষ্টের ন্যায় নানা বাণী প্রকাশ করিত। এইভাবে তাহাকে লইয়া বেশ আনন্দের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলাম ও তাহাকে শ্রীরামপুর আমার গুরু ভাই রামদয়ালের নিকট লইয়া গিয়া আমি বাড়িতে না থাকা সময়ে তাহাকে গুরু স্বীকার করায়, তাহার নিকট হইতে চাহিয়া দায়িত্ব আমার নিকটে আনিলাম এবং সেই হইতে সেও বিশেষভাবে যোগ দিতে লাগিল। আমি প্রাণপণ চেষ্টাতে তাহার মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিতে লাগিলাম। আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে নিজ গ্রামস্থ বন্ধু শ্রী বীরচন্দ্র পাল তাহার সঙ্গে আমাকে খোয়াই লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। সেমতে আমিও স্বীকৃত হইয়া রওয়ানা হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম, ইহাতে পিতৃদেব বলিলেন- বাবা ! এতকাল তোমাকে বুকে বুকে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছি, আর অল্পদিন অন্ততঃ আশ্বিন মাস পর্যন্ত কোথাও যাওয়ার আবশ্যক নাই। বোধহয় ইহার অতিরিক্ত সময় আমি থাকিব না, তারপর আমার দেহান্তে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইও, এই কথাতে আমি বাস্তবিক অতিমাত্র আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এমন হঠাৎ মৃত্যুর কোন কারণ বা ছায়াও হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত না, তাহাতে নানা প্রতিবাদ করিলাম। শেষে বলিলেন- বর্ষাকালে পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে গেলে হয়তঃ জ্বর হইতে পারে- আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক পিতৃদেবের হৃদয় অমানুষী করুণাতে পরিপূর্ণ ছিল। একবার অনেক পূর্বে আমার দুই খুড়া আরাকান রওয়ানা হয়েন। তাঁহাদিগকে রওয়ানা করাইয়া দিয়া রাত্রিকালে ব্যাকুল হইয়া, সারা রাত্রি পথ হাটিয়া যাইয়া আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন।

ইতিমধ্যে জানা গেল আমার কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতি হেমন্ত জ্বর প্লীহা রোগে নিতান্ত কাতর, কাজেই পিতামাতা নিতান্ত অধীর হইলেন। যেহেতু সে সময়ে প্লীহারোগী মোটেই বাঁচিত না। নানা আলোচনায় অগত্যা তাহাকে স্বামীর বাড়ি হইতে এখানে আনিয়া চিকিৎসা করা সাব্যস্থ করিয়া- আমি নিজে যাইয়া আনিলাম ও নানা উপায়ে চিকিৎসা করান হইতে লাগিল।

বর্ষা চলিতে লাগিল। গুরুদয়ালকে সঙ্গে লইয়া নানাবিধ রহস্যে দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তাহাতে একদিন স্বপ্নাদেশ হইল- একজন শ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণের কৃশদেহ মুসলমান ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এবং আরও অনেক অনেক বিষয় জানা গেল। এদিকে পিসতুতো ভগ্নী মোহনবাসীও জ্বর- প্লীহাতে আক্রান্ত হইয়া আমাদের এখানেই আসিল এবং চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিল। মহামায়ার আবির্ভাবে শারদাকাশে অপূর্ব জ্যোতি প্রকাশ হইল। ধরাপৃষ্ঠ নব দুর্বাদলে সজ্জিত হইয়া মায়ের আগমনী শোভা বর্দ্ধিত করিল। শিশু, বৃদ্ধ, বালক, নরনারী সকলের হৃদয়ে আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

পিতৃ-বিয়োগ

শারদীয় উৎসবের আনন্দের দিনে অজানিতভবে আমার মাথার মণি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতে লাগিল- জীবন-সর্বস্ব পিতৃদেবকে হারাইতে বসিলাম- মহালয়া প্রতিপদ তিথিতে বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহরের সময় আমাদিগকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

হবিষ্যান্ন করিবার সংস্থানও ঘরে নই। যে কোনও রকমে যোগাড় হইতে লাগিল। মধ্যম খুড়া বসন্তচন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম হইতে বাড়ি আসিলেন, শ্রাদ্ধের সময় নিকটবর্তী, পিতৃদেব পূর্বেই বলিয়া ছিলেন- ভিক্ষা করিয়া শ্রাদ্ধ করিও। এই কথার উপর শ্রাদ্ধের টাকার এক রকম যোগাড় হইলেও নবীনগর জমিদার বাড়িতে গেলাম। মোহিনী বাবুর সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় ছিল, এক্ষণে তিনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পিতা ও পুত্রে চারি টাকা দিলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর সরকারের নিকট হইতে এক টাকা পাইলাম, গোপীমোহন রায়ের নিকটও যাইয়া বলিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন- কিছু কাল পরে আবার আসিবেন।

বড়লোকি চাল

কিছুকাল পরে যাইতেছি অমনি দরজায় দারওয়ান নিষেধ করিল, ফিরিয়া যাইতেছি আবার ডাকিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়াছি, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ সরকারে কত দিয়াছে। তারপর একটা খাটো ছোক্‌রা দ্বারা একটি টাকা দেওয়াইলেন- বাহির হইলাম, মনে ভাবিলাম- বড়লোকি চাল।

বড় বড় সব কোই কহে
বড়মে তাল খেজুর
ফল পাওন কা নাহি যাওয়ে
ছায়া পাওনকা দূর।

পিত্রবাক্য পালন করিয়া বাড়ি আসিলাম, আরও দশ টাকা করজ করিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলাম।

গুরুদয়ালকে মন্ত্র প্রদান-বিল্বতলে এক সন্ন্যাসী ও যুগল-মূর্তি দর্শন

ইতিমধ্যে সহচর পাগল গুরুদয়ালসহ একদিন বিকালে বাগিচার মধ্যে বিল্বতলার নিকটে বসিয়াছি ও নানা কথা আন্দোলন করিতেছি। এমতসময় সে বলিল- আপনি আমাকে একটি বিশেষ কোনও নাম প্রদান করুন, আমি অদ্য রাত্রিতে বিল্বতলাতে বসিয়া নাম জপ করিব- ইহাতে মনের সাধন কিংবা শরীর পতন। যা'হওয়ার তাহা ঘটাইব, এই কথাতে আমিও স্বীকৃত হইয়া সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে তাহাকে একটি নাম বলিয়া দিলাম এবং যেভাবে জপাদি করিতে হইবে তাহার নিয়ম জানাইলাম ও আসনাদির প্রক্রিয়া দেখাইয়া বলিলাম- ভয় করিও না, আমাকে মা রাত্রিতে বাহির হইতে দিবেন না, যেহেতু আমার পিতৃদশা যায় নাই, নতুবা সঙ্গেই থাকিতাম। সে যাহা হউক নিয়ম মতে কাজ করিও। সে ত খুব আত্যন্তিক সাহসের সহিত অভিমত প্রকাশ করিল এবং তখনই বিল্বতলায় কতকটুকু জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে এমন সময় আমি চলিলাম।

এই বাগানও নিজে ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই। গ্রামস্থ যে হরিমোহনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সে এই বাগানের সৃষ্টি করে। আমার মনে সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা হইত যে, একটি ফুল বাগানের মধ্যে একটি ঘর উঠাইয়া সর্বদা ধর্মালোচনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই আনন্দ হইত। এই বাসনাও কেবল হৃদয়েই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অভাবে মনের দুর্বলতায় নানা কারণেই হইয়া উঠিতে পারে নাই, আরো বিশেষতঃ দয়াময় যাহা যে সময় নির্দিষ্ট রাখিয়াছেন তাহাই হইবে। কাজেই ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ধীরে ধীরে কে জানে যে, এ সকল আয়োজন আমার জন্যই করিয়া আনিতেছেন।

এদিকে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে, গুরুদয়াল বিল্বতলায় নাম জপ করিতেছে, নিতান্ত নিবিষ্টমনা হইয়া বীর সাধক সাধনাতে আত্মমন সংযোগে লীলাময়ের লীলারহস্য ভেদ করিয়া অন্তঃরাজ্যে ডুবিয়াছে, আমিও নিদ্রা যাই নাই ! মন কেবল তাহার অভিমুখেই টানিতেছে ও নানা চিন্তায় মন ক্রমেই অল্প অল্প নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে। ক্রমে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ গুরুদয়াল লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্য দর্শনে অতিমাত্র আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিয়া উঠানের মধ্যে পড়িয়া গেল, আবার দৌড়িয়া বাহির বাড়ির কাচারী ঘরের মধ্যে গেল। আমি বাহির হইতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু সকলে সাপটিয়া ধরিয়া রাখিল। কি করি- আমিও আত্মহারা পাগল হইলাম। দক্ষিণের ঘরে খুড়া মহাশয় বসন্তচন্দ্র দত্ত ঘুমাইতেন। গুরুদয়ালও সেই ঘরে যাইয়াই চিৎকার করিতেছে ও সকলকে ডাকিতেছে- দেখ দেখ, দেখ অই দেখা যায়। দেখ ঐ ঐ ঐ ঐ বলিতে বলিতে দক্ষিণের দরজায় দুইটি বড় ছিদ্র করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল এবং আবার চিৎকার দিতে লাগিল। তখন খুড়া মহাশয় অতি যত্নের সহিত তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বারে বারেই দরজার ছিদ্র দিয়া বাগিচার অভিমুখে চাহিয়াই ঐ দেখ, ঐ দেখ কত বড় চক্ষু বাবারে বাবা, ইঃ ইঃ ইত্যাদি শব্দে দিকবিদিক প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। আমিও অগত্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পর একটু সুস্থ হইয়া সে স্থিরভাবে শয়ন করিল, আমিও শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাত হইল ! তাহাকে লইয়া বিল্বতলায় আসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কেন এমনতর করিলে। বলিতে লাগিল-

আমি খুব নিবিষ্ট মনে জপ আরম্ভ করিয়াছিলাম, প্রাণে কিছুমাত্র ভয় ছিল না বরং সাহস অতিশয় বেশি বোধ হইয়াছে। জপিতে জপিতে কতক্ষণ পর আত্ম-মনসংযোগ হইলে বাগিচা আলোকিত করিয়া মহান জ্যোতি দেখা দিল। আসনসহ বাগান বাড়ি যেন কম্পিত হইল। ক্ষণপরে, দীর্ঘ জটাজুট প্রকাণ্ড দেহ অতি বড় বড় চক্ষু এক সন্ন্যাসীর মত মহাপুরুষ আমার পার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরেই দুইটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আসিয়া বাগিচার মধ্যে নৃত্য আরম্ভ করিল। চন্দ্র সূর্যের মত দুই চক্ষু তারা জ্বলিতে লাগিল। কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া তামাসা দেখিলাম, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে ভয় আসিল ও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গেলাম। ইহার পরেও আপনারা কেহ আসিয়া দেখিলেন না। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণের ঘর হইতে দৃষ্টি করিয়া দেখিয়াছি,- কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, থামাইলাম- অনেক আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে একরকম সেই রহস্যের আন্দোলনায় সেইদিন কাটিয়া গেল। অতঃপর সে আর বিল্বতলায় না বসিয়া আমি যে ঘরে ঘুমাইতাম সারারাত্রি সেই ঘরের দরজায় বসিয়া থাকিতে লাগিল। একটু মাত্র নিদ্রা হইত না।

পিতৃ শ্রাদ্ধ, যোগনিদ্রায় যমদূত দর্শন ও ভগ্নী বিয়োগ

শ্রাদ্ধের সময় নিতান্ত সন্নিকটবর্তী হইল। যে কোনও রকমে বৃষোৎসর্গ সম্পাদন করিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইতেছিলাম, কিন্তু এদিকে ভগ্নী হেমন্তকে পূর্বেই প্লীহা রোগাক্রান্ত অবস্থায় চিকিৎসার্থ আনা হইয়াছিল। তাহার অবস্থা পিতার মৃত্যুর পর হইতেই খারাপ হইতে চলিয়াছে। অদ্য যোগ বিসর্জ্জনের দিন অল্প বেলা থাকিতেই মৃত্যু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। দুই তিন দিন হয় শব্দ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, কি করিব বিপদের পর বিপদের আঘাতে হৃদয় বাঁধিয়া বসিয়া রহিয়াছি। রাত্রি চারদণ্ড হইয়াছে, পৃথক বিছানায় রোগী শয্যাশায়ী- মা নিকটে উপবিষ্ট। সন্নিকটেই অন্য বিছানার পার্শ্বে আমি; ভগ্নীপতি কৃষ্ণ কুমার, পিসতুত ভাই রজনী আর অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নী লইয়া বসা আছি। গুরুদয়াল বারিন্দায় বসা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় একটা বালিশ বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাথা একটু অবনত করিয়া চিন্তা ও দুঃখের অবসানের জন্য দয়াল নাম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছি। গুরুদয়ালও বসিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছে, অন্যান্য সকলে কথোপকথনে সময় কর্ত্তন করিতেছে এমন সময় হঠাৎ আমার তন্দ্রা হইল। সম্মুখে প্রকাশিত হইল,- বারিন্দার ধারে চেয়ে দেখি- প্রায় দশ বার হাত লম্বা এবং সে পরিমিত বলবান দেহ বিস্তৃত অতি বড় দু'টি চক্ষু ও গোঁফ বিশিষ্ট স্কন্ধে অতি প্রকাণ্ড এক গরমুদ একহাতে ধরিয়া আমার মুখোমুখি হইয়া হাসিতেছে ও বলিতেছে।

"পশ্চিম দিকে ফেলে দে" আমি চিৎকার করিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া নিকটের ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম- পশ্চিম দিকে ফেলে দিতে বলো। বারান্দা হইতে গুরুদয়ালও তখনই চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল- পশ্চিম দিকে ফেলে দে। ব্যাপারখানা কি বিস্মিত মনে প্রকাশ করিলাম ও তখনই রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীমান ক্ষেত্রমোহনকে বলিলাম- নাড়ী টিপিয়া দেখ। সে নাড়ীতে ধরিয়াই কাঁদিয়া উঠিল। বুঝিলাম ভগ্নীটির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। পশ্চিমে আমাদের পারিবারিক শ্মশান। কাজেই সেখানে ফেলিয়া দিবার আদেশ করিয়াছে। এই কি যম ? কি জানি- এ রহস্য কে ভেদ করিবে ! সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত ব্যাপার যদি কেহ আধ্যাত্মিক রাজ্য আলোচনা করিয়া ধ্যান ও দর্শনের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তবে মাত্র তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

উপর্য্যুপরি বিপদে ভয়ে বিস্ময়ে শোকে দুঃখে অধীর না হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। অনেক রাত্রির পর চিতামূলে ভগ্নীর দেহ উঠাইয়া দিলাম। বেলা প্রায় ছয় দণ্ডের সময় দাহকার্য শেষ হইল- বাড়িতে আসিলাম।

এই পর্যন্ত এতবড় পরিবার পিতা ও ছোট খুড়া দুইজনের উপার্জ্জনের দ্বারা একমত চলিয়াছি। এখনে একা খুড়া মহাশয় অতি কষ্টেও আর অভাব মোচন করিতে পারিতেছেন না, দ্বিতীয়তঃ তিনি অতি ক্ষণক্রোধী, সামান্য কারণেই নানা কটু কাটব্য আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন। কি করিব- ক্ষোভে দুঃখে দিনের পর দিন গণিতে লাগিলাম। আর একটি ভগ্নীকে রছুল্লাবাদে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। সে পিতার মৃত্যুর দুই দিন পর এখানে আসে ও হেমন্তের মৃত্যুর পর স্বামী ভবনে গমন করে। দুই তিন মাস পরে জানিলাম তাহারও জ্বর এবং প্লীহা হইয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছে। হায় ! কি ব্যাপার, কি সব ঘটনা একবারে বিপদের পর বিপদে পর্যুদস্থ হইতে হইল। এদিকে সংসারের অভাবেও নিতান্ত অধীর, কি করিব ভগ্নীটিকে শুশ্রূষার জন্য আমাদের এখানেই পৌষ মাসে আনা হইল। চিকিৎসাতেও বিশেষ কোন ফল দেখা গেল না। নানা চিন্তা ভাবনায় অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

শ্রীরামপুরের মেলা
আপ্তাবুদ্দিনের আগমন ও বিল্বতলাতে গুরুদয়াল
পৌষ সংক্রান্তি ১৩০৯ বাংলা

আদুমা নামক জনৈক অতি চতুর জালিয়াত জুয়াচোর নানা দেশ হইতে ভোজবাজী শিক্ষা করিয়া এবং নানাবিধ যাদুটুনা উচ্চাটন স্তম্ভন প্রভৃতি অবভৌতিক ঔষধ যন্ত্র কৌশলাদি অভ্যস্ত করিয়া জেল খাটিয়া অবশেষে ফকির নামে গোপালপুর বাড়ি করিয়া শ্রীরামপুরে খুব প্রতিপত্তি প্রতিভা করিয়াছিল। সে সময় অনেক লোক তাহার চাতুরী জালে অনুরক্ত হয়, তাহার মধ্যে নবীন দত্ত একজন। উক্ত ফকির তাহাকে নানাবিধ ভানে প্রলোভিত করিয়া নিজের নাম যশ জাহির করিবার জন্য উক্ত নবীন দত্তের বাড়ির শ্মশানখলায় এক মেলা করে, তাহাতে গোলমোহম্মদ এবং শ্রীরামপুরের রামদয়াল আসে এবং নানাবিধ আলোচনা ও সঙ্গীত বাদ্য হইতে থাকে। তাহাতে একজন নাথ বংশীয় সাধু সন্ন্যাসী গোছের লোক উপস্থিত হয়, রামদয়াল কেন যেন উত্তেজিত হইয়া ঐ সাধুর সঙ্গে গোলমাল উপস্থিত করে এবং তাহার পায় ও রামদয়ালের গলায় কাপড় দিয়া বাঁধিয়া একদিন এক রাত্র পর্যন্ত নানা রকমের গোলযোগ করিতে থাকে, তাহাতে সাধারন লোক নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়ে ও গোলমোহম্মদের ভাগিনা বসরউদ্দিনকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। এই সংবাদ শুনিয়া আমি ও গুরুদয়াল সেখানে বেলা নয়টার সময় উপস্থিত হই,- যাইয়া দেখি বিস্তর লোক বসিয়া আছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাল গোসাই নামক এক ব্রাহ্মণ সাধকও সেখানে ছিল। আমি যাইয়া

মাটিতে বসিলাম এবং বসিয়াই প্রার্থনার ভাবে এক বক্তৃতা দিলাম। পরে সকলের নিকট পরিচিত হইয়া, রামদয়ালের ঘটনা শুনিলাম। আমি পহুঁছিবার অল্প পূর্বেই সন্ন্যাসীকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল, কাজেই সমালোচনা ভিন্ন আমার আর বিশেষ কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। বসিয়া নানারূপ আন্দোলনে মগ্ন আছি এমন সময় দুইজন লোক সম্মুখে উপস্থিত হইল- একজন প্রৌঢ় ও একটি বিনয়ী কালবর্ণ যুবক, তাহারা লালপুর যাইবে- জাতিতে বাদ্যকর, সেলাম জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। একটু পরেই আপ্তাবুদ্দিনের কথা আলাপ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম আপ্তাবুদ্দিন কোথায় ? সে নাকি খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারে শুনিয়াছি। অনেকদিন হইতে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা ! অমনি সকলে বলিয়া উঠিল- এইমাত্র যে কাল রঙ এর ছেলেটি আপনাকে ছালাম জানাইয়া, লালপুর রওয়ানা হইল সেই আপ্তাবুদ্দিন।

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বড়ই আফসোস করিলাম- কে জানে তাহার জীবন লীলার সঙ্গে পরে আমার জীবন লীলার এত সান্নিধ্য রহিয়াছে। কতক্ষণ চলিয়া গেল, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সেদিন সেখানেই রহিলাম, পরের দিন দুই প্রহরে সভা ভঙ্গ হয়, তখন এক বাড়ীতে আমি, সাধু লাল গোঁসাই, সকলে মিলিত হইয়া পরমানন্দে আহারান্তে রওয়ানা হইয়া বাড়ী আসিলাম ও সঙ্গীত রচনা হইল-

'নামের এমনি নেশা হারায় দিশা বিষামৃত এক করে

মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে নাচে সবাই প্রেম ভরে' ইত্যাদি।

শ্রীরামপুর হইতে আসিয়াই গুরুদয়াল অত্যন্ত উত্তেজিত হইল এবং বিল্বতলায় আসিয়া চৌদিকে মাটির প্রাচীর বানাইয়া মধ্যস্থলের নানাবিধ আবর্জনা বৃক্ষাদি কাটিয়া উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া নিকটে একখানা বাচারী বান্দিয়া চারিদিকে নাতার বেড়াতে বদ্ধ করিয়া সর্বদা উপাসনা করিতে লাগিল, আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জপ তপ ধ্যান সঙ্গীত উপাসনা করিয়া দিন কর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যেই শিব নাথের প্রিয় শিষ্য দুলাল চাঁদ আসিয়া নিতান্ত আসক্তির সহিত অনুগত হইয়া প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দিতে লাগিল।

এইভাবে মাঘ ফাল্গুন মাস অতীত হইলে পর চৈত্র মাসে পিসতুত ভগ্নি মোহনবাসীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ দেখা যাইতে লাগিল। তাহাকে কোনও নাম দিবার জন্য আমাকে নিতান্ত অনুরোধ করিতে থাকে ও স্বীকৃত হই। সেই দিন রাত্রিতেই আদেশ হইল- তাহাকে তাহার মায়ের বুক ছাড়া করিয়া রাখ- দেখাইল, সে বাঁচিবে না এবং আমাকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিল। এমতাবস্থায়ই তাহারও জীবন লীলা অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া অনেক দুঃখে কষ্টে ১৩০৯ সনে যবনিকা পতন হইল।

সংসারই বিরম্বনা বিতলং যাত্রার পথে ধ্যানযোগে গুরুদেব কোলে উপবিষ্ট দর্শন

১৩১০ সন

১৩১০ সনের প্রারম্ভ হইতেই কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী নির্মলার অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতে চলিল, কাজেই মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এদিকে সাংসারিক অভাবের দরুণও নিতান্ত যাতনা হইতে লাগিল, কি করিব- কোনওমতে দয়াল নাম ভরসা করিয়া জীবন তরী এ অকুল তরঙ্গে রক্ষা করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে একদিন খুড়া মহাশয় ভয়ানক গালিগালাজ আরম্ভ করিলেন। আমি বৈঠক ঘরে শুইয়া রহিলাছিলাম, অবিশ্রাম ঘণ্টা দুই ঘণ্টা বকাবকিতেও স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই দয়াল নাম জপ করিতে রহিলাম, আর মনকে বুঝাইলাম যে, তুমি বোধ করি যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যদি বিঘোর নিদ্রাতে এই সকল বাক্য তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ না করিত তাহা হইলেই তো আর কষ্ট হইত না। কাজেই বোধ কর যেন এখনও তুমি নিদ্রিতই আছ। অনেকক্ষণ পর পিসতুত ভাই রজনী আসিয়া ডাকিল, আমি যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম ও খুব প্রশস্ত এবং সহাস্যবদনে আলাপ করিতে লাগিলাম। রজনী আমাকে খুড়া মহাশয়ের তীব্র কটুক্তি জানাইল, আমি বলিলাম- কি জানি, আমি তো শুনি নাই। বাস্তবিক না শুনার মতই সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে লাগিলাম ও মনে সুন্দর আনন্দ পাইলাম। বৈশাখ মাস কাটিয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্মলার অবস্থা অত্যন্তখারাপ হইল। দিনের দিন অস্থিচর্মসার হইল। পরে হঠাৎ একদিন রাত্রিতে চিৎকার করিয়া উঠিল। ইতিপূর্বেই আবার আমার নিকট আদেশ হইয়াছিল- 'তাহার নিকটে যাইও না।' একদিন রাত্রিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল- কি করিব নিকটে গেলাম। ক্ষনপরেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রলাপ হইয়া তাহার জীবনলীলা শেষ হইল।

উপর্যুপরি বিপদে নিরতিশয় বিধ্বস্ত হইয়া পড়িলাম, তবে মাঝে মাঝে কোন দৈববাণী আসিয়া কেবল শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল।

ইহার অল্প সময় পরেই গোপাল সাধু ইচ্ছাময়ীর পিত্রালয় ময়মনসিংহের হাউল্লাপাড়া রওয়ানা হইল। ইচ্ছাময়ীর ভগ্নীর পুত্র শ্রী নিশিকান্ত দাস পূর্ব হইতেই এখানে আসিত সে বিশেষ কোন ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া গোপাল সাধু এবং আমাকে আহ্বান করে। কজেই সেদিকে নৌকাযোগে রওয়ানা হইয়া পরের দিন উপস্থিত হইলাম, জানিলাম- সে কোন স্ত্রীলোকের অপগর্ভ করিয়া তাহা পাত করিয়াছে, কাজেই মনে যৎপরোনাস্তি অশান্তি হইল এবং তথা হইতে রওয়ানা হইবার প্রস্তাব করিলাম।

এদিকে নিশি দাস তাহার ভগ্নীর বাড়ীর পাশে ধরের বাড়ীতে লইয়া যাইতে নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তথা হইতে বিতলং আখ্ড়া অতি নিকটবর্তী। মনে ভাবিলাম এতদুপলক্ষে আখ্ড়া দেখিয়া যাইব। এই আশা ও উৎসাহে রওয়ানা হইলাম।

রাস্তায় মেঘনার মধ্যে হঠাৎ মেঘ ও বাতাসে নৌকা ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 'দয়াময়' যেন রক্ষা করিলেন, রাত্রিতে গোয়ালনগর স্টেশনে যাইয়া নৌকা রাখিলাম। কিন্তু দু'চার মিনিটের মধ্যে এত মশা অনুভব হইল যে, হাতের মুষ্টি ভরিয়া যাইত। কাজেই তথা হইতে নৌকা ছাড়িয়া অনেক রাত্রের পর লাখাই স্টেশনে যাইয়া রহিলাম। পরের দিন প্রাতে রওয়ানা হইয়া দুই প্রহরের পর সাঙ্গর গ্রাম পঁহুছিলাম।

সেদিন বেশ পরমানন্দে তথায় কাটইলাম। রাত্রিতে উপাসনা সময়ে ধ্যানে বসিবামাত্র অলৌকিক মহান এক জ্যোতি দিক্-দিগন্ত বিভাসিত করিয়া প্রতিভাত হইল, সেই জ্যোতিমণ্ডল মধ্যে শ্রীমদ্ গুরুদেব আমার কোলে উপবিষ্ট। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ রহস্যে নিমগ্ন থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম ও পরদিন আখ্ড়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম।

বাস্তবিক এই আখ্ড়াতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্যের অতি সুন্দর সমাবেশ দেখিবার বিষয় বটে। অনেকেই দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন বলিয়া বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া কেবল বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেছি।

আমরা যে সময়ে আখ্ড়ায় উপস্থিত হই তখন বেলা নয়টা হইবে। বাহিরের ফটক পার হইয়া ভিতরে গোঁসাইজীর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের ভিত্তির উপর যে প্রকাণ্ড লৌহ শলাকা বেষ্টিত ঘর আছে, তাহার মধ্যে যাইয়া বসিলাম। মেয়েলোককে ঐ লৌহ ফটকের বাহিরে থাকিতে হয়, পুরুষ মাত্রই ভিতরে বসিতে পারে। পৃথক বিছানার কোনও আবশ্যক পড়ে না। সেই পাথর বাঁধান ভিত্তিই অতি সুন্দর মখ্মলের বিছানার ন্যায় শোভা পাইয়া অভ্যাগতদের বসিবার আসন প্রদান করিবার জন্য সোহাগের সহিত আহ্বান করিতেছে।

নিকটে শ্বেত পাথরের একখানা চৌকির উপর গোঁসাইজীর ব্যবহৃত কোন কোন জিনিস ও পাদুকা রক্ষিত হইয়াছে। এক পার্শ্বেই সমতল ভিত্তিতে মহান্তজীর বসিবার আসন। তিনি স্নানাদির পর তথায় বসিয়া সমাগত লোকদিগকে উপবেশ, আশীর্বাদ ও মন্ত্র প্রদান করেন। সেইদিনও বসিয়া কোনও শিষ্যকে গীতার শ্লোক বুঝাইতেছেন। আমরা পাঁচ সাত জন অদূরে উপবিষ্ট। তাহার মধ্যে আমি ঐ গীতার্থের মধ্যে প্রশ্ন উপস্থিত করিলাম। আলোচনা আরম্ভ হইল- ক্রমেই অতি গুরুতরভাবে তর্ক চলিতে লাগিল। উভয়েই প্রেম ভরে উত্তেজিত হইয়াছি, এমন সময় মহান্তজী আসন ছাড়িয়া

নিকটে ভাণ্ডারখানা ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গনের পার্শ্বে আমাকে লইয়া গেলেন ও জিজ্ঞাসা করিতে লগিলেন-

মহন্ত- আপনার গুরু কে ?

আমি- যিনি আমার গুরু, তিনি ন হিন্দু, ন মসুলমান, ন খৃষ্টান, ন ইহুদী।

মহন্ত- আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না। ঠিক কথা বলুন। হয়তঃ আপনি বিশেষ কোনও মহাপুরুষের কৃপার পাত্র, নৈলে আমার সঙ্গে এতকাল তর্ক করিতে সাহস পাইবার কথা ছিল না। যেহেতু এ যাবত, কত সহস্র সহস্র গণমাণ্য ভদ্র ব্রাহ্মণ এই আখ্ড়ায় আসিতেছে, কেহই কখন এইরূপ তর্কাদি করে না। অতএব আপনাকে বলিতে হইবে আপনার গুরু কে ? আপনার সঙ্গলাভে আমিও যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি, অতএব বলুন।

আমি- না, বলিব না। আমার গুরু সাব্যস্থ হইবে কি ? আমি তো শিষ্য হইতে পারি নাই।

মহন্ত- দেখুন, আপনি আর আমাকে ছলনা করিবেন না। বাস্তবিক আমি নিতান্ত কৌতুহল পরবশ হইয়াছি। এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

আমি- আচ্ছা, আপনার বাক্যের উত্তর আমি দিব। কিন্তু আমার একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর আপনাকেও দিতে হবে এবং সেই জন্যই এত আন্দোলন ও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য।

মহন্ত- কি প্রশ্ন- বলুন।

আমি-বোধহয় আপনি কপটতা করিবেন না। বিশেষতঃ নিজেও আপনি শিক্ষিত লোক, অতএব বলুন- সরলভাবে উত্তর দিবেন।

মহন্ত- হ্যাঁ, নিশ্চয় দিব- যে কোনও গুহ্য কথা হইলেও দিব।

আমি- তবে শুনুন, বোধহয় আপনার পূর্বের প্রাচীন মহন্তকে আপনি দেখিয়াছেন, বলুন দেখি- তিনি কি বলিয়াছেন? এমন কি গুহ্য মন্ত্র কিংবা ভাষা আছে যাহার সাধনা বলে গোঁসাইজী সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া এই অপূর্ব অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। কত আলৌকিক ঘটনা করিয়াছেন, ঐশ্বর্যে মাধুর্যে একত্রে মিলাইয়া রাখিয়াছেন- সেই মন্ত্রখানা কি ? আপনি জানেন, অথবা আপনার কি সে ক্ষমতা আছে- তাহাই জানিতে চাই।

মহন্ত- অবশ্য অতি গুহ্য প্রশ্ন আপনি করিয়াছেন। এমত প্রশ্ন কেহই কখন করে নাই। তবে আমিও সরলভাবে তাহার উত্তর দিব। আমি যাহাকে মহন্ত পদে দেখিয়াছি,

অর্থাৎ যিনি আমার পূর্ববর্তী ছিলেন, তিনি অতি বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা অনেক ছিলাম, কিন্তু আমার শৈশবাবস্থায়ই তিনি সর্বদা গল্প করিতেন যে, আমিই ভবিষ্যৎ মহন্ত পদে অভিষিক্ত হইব এবং অতিশয় ভালবাসার সহিত আমাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। একদিন আপনার ন্যায় আমিও আমার চিত্তের আত্যন্তিক প্রেরণাতে, গোসাইজীর গুহ্য সাধনমন্ত্রজনিত প্রশ্ন করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি অনেক উপদেশের উপর এইমাত্র বলেন- বাবা ! **'গুরু সত্য'** এই ধ্রুব সিদ্ধ মন্ত্র, ইহার উপর আর কোন মন্ত্র নাই বা হইতে পারে না। এই মন্ত্রে যিনি অনুপ্রাণিত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ যোগী, মহাপুরুষ- তাহার অসাধ্য জগতে কিছুই থাকে না- অর্থাৎ এই মন্ত্রবলে সকল সাধ্য সাধনই পূর্ণ হয়। এতদভিন্ন নিশ্চয়ই বলিতেছি আর কোনও দ্বিতীয় গুহ্য বিষয় নাই। আপনার নিকটে আমার অবক্তব্য নাই- ইহা সত্য

বলুন- আপনার গুরু কে ?

আমি- অবশ্য আপনার কথায় আমার হৃদয়ে তৃপ্তি আসিল এবং জ্ঞানের পরিচয় পাইলাম। অতএব বলিতেছি আমার গুরু সরাইল কালিকচ্ছ নিবাসী শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ স্বামী। তিনি বিস্মায়াবিষ্ট হইয়া আমাকে আবার ধরিলেন ও অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে বলিলেন যে, হ্যাঁ তবে তিনি তো আমারও গুরু। আমি তাহারই নিকট সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং অন্যান্য অনেক উপদেশ পাইয়াছি। তিনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন। বাস্তবিক বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, আপনি মহাপুরুষেরই শিষ্য। আসুন- এই বলিয়া আবার স্বস্থানে উপবেশন করিয়া নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। আমি বসিয়া বসিয়া ঐ **'গুরু সত্য'** কথাটি হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম ও ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

'গুরু সত্য' অর্থাৎ গুরুর সত্ত্বা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করা যদি সত্ত্বা সত্য হয়, তবে বিশ্বাসও অকাট্য হইবে- বিশ্বাস বলেই সফল হইতে পারে। এই আলোচনার কিছুকাল পরেই যার যা অভিরুচি আহার করিয়া রওয়ানা হইলাম। আহারেরও এক ভারী রহস্য হইল- তাহাও লিখিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছি। সেবক সম্প্রদায়ের যিনি কর্তা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- আপনারা কি আহার করিবেন ? গোপাল সাধু তো পূর্ব হইতেই জাতিত্ব ছাড়িয়াছে, সে বলিল পাকেই খাইব। সেখানকার সকলেই নেশাখোর বহির্ভূত জাতি, আমার সঙ্গে আবার সাঙ্গর গ্রাম হইতে কয়েকটি ভদ্র সন্তান তথায় গিয়াছিল, আমি জাতিত্ব স্বীকার না করিলেও তাহাদের

ভদ্রতার অনুরোধে মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। তাহারা আমার দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল এবং পরস্পরের ভাব গোপন রাখিয়া সাব্যস্থ হইল- চিড়া খাইব।

আখড়াতে প্রত্যহই বহুসংখ্যক নানাজাতির লোক দর্শক হয়। তাহাদের অভিরুচি মতনই আহারের আয়োজন দিয়া থাকেন। যাহারা পাকে প্রসাদ নেয়, তাহাদের জন্য বিস্তর অন্ন- ব্যঞ্জন প্রস্তুত, কোন অভাব নাই। মহোৎসবের মত নিত্য নিত্য মহাসেবা হইয়া থাকে। কাহাকেও চিড়া, কাহাকেও অভিরুচি মত পাকের আয়োজন দিয়া থাকেন। আমাদিগকে চিড়া, নারিকেল, ঘৃত, চিনি, লবণ আরও কি কি দিলেন। আমরা নৌকাতে আহার করিতে বসিলাম, তাহাতে চিনি ও লবণ ঘটনাক্রমে একত্র মিশ্রিত করা হয় ও আহারের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হয় এবং তাহাতে সকলেই নিতান্ত বিস্মিত ও বিরক্তমনা হই। কথায় কথায় এবম্বিধ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া আমি বলিয়া ফেলিলাম- মহাশয়, খাওয়া ত হইল না, ভাত খাইলেই কি হয়। আমার তো ইচ্ছা ছিল- ভাত খাওয়ারই, আপনাদের কারণে হইল না, তাহাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। অমনি তাহারা হৃদয় খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, আমরা তো ভাতই খাইয়া থাকি, আপনার ভয়ে খাই নাই। বেশ তো একমজার কথা উঠিল, রহস্যে ব্যাপৃত হইয়া অগত্যার পর আহার শেষ করিয়া রওয়ানা হইলাম। গোপাল সাধু নাকি ভাতই খাইয়াছিল।

সেদিন সাঙ্গর গ্রামে থাকিয়া, নিশি দাসের ভগ্নী পাষানময়ীর ঘরে আদরে যত্নে নিতান্ত আনন্দিত হইয়া পরের দিন রওয়ানা হইয়া বাড়ীতে আসিলাম। এদিকে জয়নগরে খুড়া বসন্ত কুমার দত্ত মহাশয়ের খুড়তুত শ্বশুরের বাড়ীতে মেয়ে বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। দেশশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করিলেন, কাজেই খুড়া মহাশয়ের প্ররোচনায় তথায় গোলাম। বহু ঘটাপূর্ণ উৎসব হইল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ হইতে খেমটাওয়ালী আসিয়াছে। আমিই এক প্রকার সকলের উপর কর্তৃত্ব খাটাইতেছি। এমতাবস্থায় গানের আসরেও আমারই খুব পসার। সম্মুখে আতর গোলাপদানী লইয়া বসা হইয়াছে, এমন সময় যামিনী খেমটাওয়ালী দুই তিনটি সঙ্গীতের পর নিম্নোক্ত গানটি ধরিল-

'যদি নাহি থাকে প্রাণে আকুল পিয়াসা
কাজ কিরে তোর ভালবাসা'

এই পদটির সুর তান লয় যোগে তীক্ষ্ণ তীর ফলকের ন্যায় আমায় বিদ্ধ করিয়া হৃদয়ে সকল আনন্দের বেগ থামাইয়া দিল। এমন কি তখনই চক্ষে জল আসিল বেগে দৌড়িয়া আসর হইতে সড়িয়া পড়িলাম। নিকটে এক খড়ের পাড়া ছিল, তাহার নীচে

পড়িয়া ভাবাভাবের সংগ্রামে কতকিছু কান্দিলাম ও পরে একটা শূন্য পাল্কীর মধ্যে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। ঘুম মোটে হইল না, যেন একটা পাগলের মত কেবল ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ তন্দ্রার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাহাতে হঠাৎ দেখিলাম- একটি শ্বেতবর্ণ কুকুর, এক চক্ষুতে ভুরু নাই, এমত কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত আকৃতি বিশিষ্ট কুকুরটি আমাকে দুই তিনটি কথা বলিল- আবার জাগরিত হইলাম- রাত্রি প্রভাত হইল। বিকালে রামকুমার নাখোদা আমার চরিত্র দেখিয়া ও কাজকর্ম দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্টের সহিত ডাকিয়া বলিলেন- মনোমোহন, তুমি কারবারে কাজ করিবে ?

আমি- দয়া করিয়া যদি রাখেন, তবে করিতে পারি।

কর্তা- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে আমার কারবারে কাজ দিব (চট্টগ্রামে উক্ত ভদ্রলোকের বড় তেজারতী কারবার আছে, খুড়া মহাশয় তথায় কাজ করেন)।

আমি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলাম। মনে ভাবিলাম- হওক, মন্দ নয়, বোধহয় ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়াছেন। এতদিনে তবুও একটু অর্থ উপার্জনের পথ হইল।

এই কথার পর সেই দিন কাটিয়া গেল, পর দিন প্রহরেক বেলার সময় রওয়ানা হইবার আয়োজন করিলাম ও বিদায় হওয়ার জন্য কর্তার আদেশ লইলাম। তিনি অম্লান চিত্তে চট্টগ্রাম যাওয়ার হুকুম দিলেন। যথাবিধি অভিবাদন করিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিলাম। কি আশ্চর্য্য ! আসিয়া দেখি স্বপ্নদৃষ্ট কুকুরটি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতেছে। অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম যে, পূর্বদৃষ্ট আকৃতি হইতে তাহার আকৃতির একতিলও বৈষম্য লক্ষিত হইল না। দাঁড়াইয়া মনে মনে নানা কথা ভাবিতেছি, ক্রমেই কুকুরটি আমার সঙ্গে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। রওয়ানা হইলাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল, রাস্তায় নদী সাতরাইয়া, পথে অন্যান্য স্বজাতি প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে কোথাও যুদ্ধ করিয়া, কোথাও পালাইয়া অতিদূরে ছুটিয়া গিয়া আবার পাশ কাটিয়া দৌড়িয়া আমার পেছনে পেছনে একেবারে বাড়ী পর্যন্ত উপস্থিত হইল। আমিও যথেষ্ট যত্ন নিতে লাগিলাম। সেও আমাকে চির পরিচিতের ন্যায় সোহাগ জানাইতে লাগিল। কিন্তু বাড়ীতে আরও দুই একটি কুকুর ছিল, তাহাদের যন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল, দুই দিন পর নিকটবর্তী এক বাড়ীতে বিবাহের বাদ্য ভাণ্ড আসিতেছে। আমি ও আরও কয়েকজন দেখিবার জন্য অদূরে দণ্ডায়মান হইলাম। কুকুরটিও সঙ্গে যাইয়া সেই গোলমালে মিশিয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য ! অতঃপর অনেক অনুসন্ধানেও আর তার কোনও খোঁজ খবর পাইলাম না।

কর্মসংস্থানে চট্টগ্রাম যাত্রা

চট্টগ্রাম যাব যাব মনে করিয়া কতদিন কাটিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলায় ভারী মনোযোগ দিলাম। ইতিমধ্যে আমি আর কখনও তাস খেলি নাই, এমন কি চিনিতামও না। ঘটনাবশতঃ অভ্যস্থ হইলাম এবং এই আমোদে বড় স্ফূর্তির সহিত দিন কাটাইতে লাগিলাম। তাহাতে একদিন রাত্রিযোগে স্বপ্নে দেখি- গুরুদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান, অতিতীব্রভাবে আদেশ করিতেছেন- আমিও সেই তাসগুলি শ্রীপদে দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম। সেই দিন হইতেই তাস খেলার ঝোঁক কমিয়া গেল।

ক্রমে ভাদ্র মাসও এক রকম শেষ করিয়া পুনরায় জয়নগরের কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হুকুম লইয়া আশ্বিনের প্রথম ভাগে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইলাম। ইহার পূর্বে একবার যখন প্রথম রেলগাড়ী হয়, তখন খুড়া মহাশয়কে বাড়ী আনিতে চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম। এইবার চাকুরীর জন্য রওয়ানা হইলাম।

রাত্রিযোগে কসবা কৃষ্ণপুর আত্মীয়ের বাড়িতে থাকিয়া পরের দিন সকালে ট্রেনে চড়িলাম, সঙ্গে সামান্য কাপড় চোপড় ও এক জোড়া সাড়ে তিন টাকা দামের নতুন জুতা ছিল।

চতুর চোর

আমি যে গাড়ীতে ছিলাম কুমিল্লা ষ্টেশন হইতে একটি চৌদ্দ পনের বৎসর বয়স্ক বালক সেই গাড়ীতে চড়িল। কথোপকথনে জানিলাম সে ফেনী নামিবে। সে সর্বদাই গাড়ীতে যাতায়াত করে এবং ছেলেটা নিতান্ত ধূর্ত। সে টুলের এক পার্শ্বে বসা, আমি দ্বিতীয় টুলে অপর পার্শ্বে, ছোড়াটির সম্মুখে আমার জুতা জোড়া ছিল। ট্রেন চলিয়াছে, আর একটি ভদ্রলোক ছোড়াটির টুলে আমার মখোমুখি বসা। উভয়ে বাহিরের নানা দৃশ্য দেখিতেছি, ট্রেন ফেনী ষ্টেশনের প্রায় নিকটে পঁহুছিয়াছে। এমন সময় সেই বালকটি আমার জুতা জোড়া গাড়ীর অপর পার্শ্ব দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া গাড়ি না থামিতেই চাবিওয়ালাকে ডাকিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম কি হে ? বলিল- আমার চাঁদরখানা পড়িয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি নামিয়া দৌড়িল। সঙ্গীয় ভদ্রলোকটি নিতান্ত সন্দিহান হইয়া বলিলেন- দেখুন মশায়, আমাদের কিছু বা নিয়ে গেল। লোকটার হাব ভাব তো ভাল বোধ হইল না। বাস্তবিক, চেয়ে দেখি আমার জুতা নাই। হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কিন্তু চোর আর ধরা পড়িল না। কি ব্যাপার ! বিস্মিত হইলাম, মানব চরিত্র কি এত জঘন্য হইতে পারে ?

ক্রমে গাড়ি চট্টগ্রাম পৌঁছিল, নামিয়া বাসায় গেলাম। সকলেই আহলাদিত হইল, খুড়া মহাশয় পূর্বেই গিয়াছিলেন ও সেখানেই ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি জল খাবার আনিয়া দিলেন। পরে রাত্রিতে আহার করিয়া ঘুম দিলাম।

প্রভাতে জাগরিত হইয়া শহরের দৃশ্য ও তাহাদের কাজকর্ম দেখিতে শিখিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রধান কর্মচারী তখন বাড়ীতে ছিলেন। এমতাবস্থায় কতদিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু মনে যৎপরোনাস্তি অশান্তি। সেই সকল কাজকর্ম, মিছে কথা, শঠতা, চতুরতা এবং কর্তৃত্ততা আমার সহিতে লাগিল না। কেবল নেই অধমতারণ নামের উপর নির্ভর করিয়া যেন অতি দুঃখে- অতি কষ্টে মনের জ্বালা মনে লইয়া দিনের পর দিন একবারে অধীর হইতে লাগিলাম। কি করি, কোথাই যাই- প্রভু তোমার কি ইচ্ছা ! এ জীবন কি এই দাসত্বের জন্য গঠিত ? না, না- গুরুবাক্য- "তোমার বিষয় নাই"- তবে কি আছে ? জীবনোপায়ের পথ কি- পরিবার পতিপালন কিসে হয়- কি করি ? কেবল উঠা পড়া ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলাম- এমন কোন লোক নাই কাহারও কাছে মনের বেদনা বলে প্রাণ জুড়াই, হৃদয়ে অপরিসীম জ্বালা, বিষয়ের বিষবৎ চাতুরীতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ইতিমধ্যে শুনিলাম- চট্টগ্রামের অদূরে গুহা আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী রুগ্ন হইয়া এক বাবুর বাসাতে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। অনেক লোক তাহার দর্শনে যাইতেছে, আমিও চলিলাম। যেয়ে দেখি- তিনি উববিষ্ট, চার পাঁচটি ছেলে বেশ সংস্কৃত স্তবগান করে। সম্মুখে যাইয়া বসিলাম, তিনি কেবল তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী কোনও স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে ব্যথিত ! সেই কাহিনীই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

আমি দৈববাণী ও স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া আবোল-তাবোল কত কিছু বলিতে লাগিলেন, তাহাতে অতিমাত্র বিরুক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে পৌষ মাসের শেষ কিংবা মাঘ মাস হইবে, ঐ কারবারের প্রধান কর্মচারী আমার উপস্থিতি সংবাদে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া তাহার কোনও আত্মীয়ের উপকার বাসনায় কর্তার সঙ্গে লেখাপড়া করিয়া মত ফিরাইয়া আমাকে তথা হইত বিদায় দিবার জন্য চিঠি দিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার আনাগোনা হইতেছিল। জানিতে পারিয়া ক্ষোভে দুঃখে- একেবারে হৃদয়ে হু হু আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সামান্য চাকুরী, তার উপর কর্তা দেবতার সাক্ষাতের আদেশ, আবার নিষেধ। দারুণ ঘৃণাতে একেবারে প্রাণ তোলপাড় করিতে লাগিল। এদিকে আবার যেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় পিঞ্জরার মুখ খোলা দেখিয়া কতক আনন্দও প্রাণে আসিল। এইভাবে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল।

মওলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ
বায়েজিদবস্তান দর্শন

মনে করিলাম আমার কার্য কেন আমি করিয়া না যাই। এখানে পূর্বতন বড় বড় পীর ফকিরের দরগা আছে, তাহা দেখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ অনেক দিন আগে কোনও এক মুসলমান ফকিরের কাছে ইছাপুর মাইজভাণ্ডার নিবাসী শ্রীযুক্ত ছৈয়দ আহম্মদ উল্লা মওলানা সাহেবের অলৌকিক প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলাম এবং তখনই তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। সে স্থান চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্যূন ত্রিশ -বত্রিশ মাইল হইবে। এই সময় এখান হইতে সে স্থানও দেখিয়া যাওয়া কর্তব্য। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট এসব সংবাদের তথ্য সুন্দররূপে অবগত হইয়া বাড়ী আসিবার পূবে সেদিকে যাওয়ার অভিমত প্রকাশ করিলাম। তাহাতে ঐ দোকানের আর এক কার্যকারকও আমার সাথী হইলেন। বিশেষতঃ সেই অঞ্চলে তাহাদের অনেক পাইকার ছিল, তলব তাগাদার জন্যও মাঝে মাঝে তাহারা যাইয়া থাকে। সঙ্গীয় লোকটি সেই তাগাদার ভার লইয়া ফকির সাহেবকেও দর্শন করিবার মানসে যাইতে প্রস্তুত হইল। তাহার দুই দিন পূর্বে- চট্টেশ্বরী কালীবাড়ী ও বায়েজিদবস্তান দেখিতে রওয়ানা হইলাম এবং কালীবাড়ীতে মায়ের শ্রীপদে ভক্তি জানাইয়া বায়োজিদ বস্তানের দরগাতে গেলাম। সেই সমাধিস্থল অতি উচ্চ এক টীলার উপর। উপরে উঠিয়া দর্শন করিলাম, অদূরে আর এক ফকিরের আশ্রম, চিহ্নকুণ্ড আছে- তাহাও দেখিলাম।

নিম্নভূমিতে আসিয়া সম্মুখের পুষ্করিণীতে কচ্ছপ সকলের লীলা খেলা দেখিলাম। সেখানে ফকির সাহেবের দোহাই দিয়া ডাক দিলেই অতি বড় বড় কচ্ছপ ভাসিয়া পাকা ঘাটের উপর আসে। তখন তাহাদিগকে খাবার দিলেও হাত হইতে নিয়া খায়, কোনও ভয় করে না। লোক- প্রবাদ যে, চট্টগ্রাম পূর্বে জিন পরীর স্থান ছিল। বায়েজিদ বস্তান মন্ত্রবলে তাহাদিগকে কচ্ছপ বানাইয়া পুষ্করিণীতে বন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক- বাস্তবিক কৌতুহল উদ্দীপক দৃশ্য বটে। অনেকক্ষণ এই তামাসা দেখিয়া রওয়ানা হইলাম। স্থানীয় সেবক পয়সার জন্য বড়ই তাগাদা আরম্ভ করিল। আমরা সেদিকে বড় ভ্রুক্ষেপ করি নাই, তবে বোধহয় যৎসামান্য কিছু দেওয়াও হইয়াছিল। সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটি কালবর্ণ রুগ্ন ব্যক্তি কাপড় গায়ে জড়াইয়া তামাক খাইতেছে দেখা গেল। মনে ভাবিলাম, সে হয়ত কোনও সাধক হইতে পারে ও এই দরগার ইতিবৃত্ত জানা সম্ভব বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, অনুমানে লোকটাকে পশ্চিম দেশীয় বোধ হইয়াছিল, তাই বলিলাম-

হ্যাঁ জী তোমার ঘর কাঁহা !

ফকির- পশ্চিম দেশ।

আমি- কেত্ না দিন ইধার হ্যাঁয় ?

ফকির- চৌদ্দ বছর গুজার গিয়া।

আরও দুই একটি কথা বলিয়াও অভিপ্রায় মত উত্তর না পাওয়াতে আমরা রওয়ানা হইয়া রাত্রিতে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ইহার দুইদিন পর মওলানা সাহেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় রওয়ানা হইলাম। বালুকাময় পথ চলিতে চলিতে ভারী কষ্ট বোধ হইল। কিন্তু মহাপরুষের শ্রীচরণ দর্শন লালসা রূপ আনন্দে কোনও মতে হৃদয় বাঁধিয়া পথশ্রম সহিতে লাগিলাম। প্রথম দিন রাস্তায় এক বাজারে পাইকারের ঘরে রাত্রি কাটাইলাম। পরের দিন রওয়ানা হইয়া দুই প্রহরে আর এক বাজারে, তাও তাহাদের পাইকারের ঘরে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া চলিলাম। প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব সময়ে নাজিরহাটের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া হাটে পাইকারের ঘরে বাসা লইলাম। খাওয়ার যথেষ্ট আয়োজন হইল, নিজেদেরই রান্না করিতে হইল। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি বহুবিধ আয়োজনে রান্না সম্পন্ন করিয়া আহারাদির পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে সহজেই নিদ্রিত হইলাম।

মওলানা সৈয়দ আহমদউল্লা শাহ্-এর আশীর্বাদ লাভ স্বপ্ন

স্বপ্নে দর্শন হইল- মওলানা সাহেব আমাকে কোলে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন ও আশীর্বাদ করিতেছেন।

প্রভাতে জাগরিত হইলাম এবং তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া মিশ্রী, খেজুর ইত্যাদি মওলানা সাহেবের সেবার জন্য লইয়া উভয়ে রওয়ানা হইলাম। তথা হইতে অনুমান চার পাঁচ মাইল হইবে। যাইতে যাইতে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। মওলানা সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। পূর্বদিকে বাহির বাড়ীর সম্মুখে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পশ্চিম পারের দক্ষিণ ভাগে কয়েকখানা কবর, চারিদিকে পাকা ছাদ, পার্শ্ব দিয়া পথ। বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গনের পর বাহির বাড়ীর পশ্চিমের ভিটাতে একখানা লম্বা ঘর, আমরা সেই ঘরের নিকটবর্তী হইলাম। প্রাঙ্গনে অনেক লোক, দুই চার জন করিয়া এক এক জায়গায় বসা আছে। কেহ শাস্ত্রালাপে, কেহ সঙ্গীতে অতি মৃদু স্বরে মন মজাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। ঘরে মশারির ভিতর এক ফকির তসবি জপিতেছেন। এক পার্শ্বে হলকরা বালিশ ও সতরঞ্জিতে একখানা বিছানা। সেখানে কখন কখন ইচ্ছা হইলে সাহেব বসেন। আমরা এদিক ওদিক করিয়া সেই ঘরের এক কোণে যাইয়া বসিলাম এবং কখন দেখা হইবে সংবাদ নিতে লাগিলাম। কেহ ভরসা দিল কেহবা নির্ভরসা করিল। এইভাবে সাক্ষাৎ লালসায় অনেক সময় কাটাইলাম। বেলা প্রায় দুই প্রহর, তখন মওলানা সাহেবকে স্নান করাইতে বাড়ীর মধ্যের প্রাঙ্গনে এক চেয়ারে বসাইয়াছেন। এমন সময় অনুমতি হইল- আগন্তুকদিগকে আসিতে বল। হুকুমের সাথে সাথে সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাইয়া নিকটে দাঁড়াইলাম। যে যাহা নিয়াছিল, তিনি

হাত বাড়াইলে সকলেই দিতে লাগিল। কিন্তু দিতে না দিতেই সেবকগণ লুট করিয়া লইয়া গেল। সম্মুখে দাঁড়াইলাম- চেহারা কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাঙ্গ অতি বৃদ্ধ, চক্ষু কোটরাগত। কিন্তু হস্ত ও পদ জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও অতি কোমল, এখনও চুল পাকে নাই, চক্ষুর ঈষৎ দৃষ্টিতে মহাতেজ ঝলসিতেছে। পায়ে ধরিয়া সেলাম জানাইলাম, বলিলেন- বাড়ী কই-

নাম কি-

কি চাও-

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলাম বাবা ! দোয়া চাই। এই কথাতে হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন। সকলেই সেলাম জানাইয়া যার যা অভিরুচি বলিয়া রওয়ানা হইলাম। অনেকে আমাকে বলিল- আপনার অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন। সে যাহা হউক পূর্বদিনের স্বপ্ন দর্শনেই আমার লালসা চরিতার্থ হইয়াছিল, কাজেই আনন্দ মনে নানাবিধ কথোপকথনে নাজির হাটের বাসায় আসিলাম।

ফকির সাহেবের অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। কথা আছে যে, তিনি প্রতি শুক্রবার মক্কা শরীফে নামাজ পড়িতেন ও অনেক সিদ্ধাই ছিলেন এবং কেহই তাঁহার বয়স নিরূপণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ অনেক রাজা মহারাজা ও মৌলভী সাহেবগণ ও তাঁহার অনুগত ছিলেন। বোম্বে মাদ্রাজ প্রদেশেও তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ হইয়াছিল।

দুই প্রহরের সময় পাহাড়ের পার্শ্বে মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম ও সেইদিন তথায় অপেক্ষা করিয়া পরের দিন রওয়ানা হইয়া তারপর দিন বাসায় পহুঁছিলাম। সেখানে আমার আর থাকা বিধেয় নয় মনে করিয়া বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম।

ফেনী রাজ কাচারীতে আমাদেরই আত্মীয় রাজকুমার সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক মুন্সী পদে নিযুক্ত আছেন। মনে করিলাম- তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। যদি তাহা দ্বারা কোনও কর্মে সুবিধা হয়, এই পরামর্শে চট্টগ্রাম হইতে রওয়ানা হইয়া ফেনী আসিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া নিজ হইতেই প্রতিশ্রুত হইলেন ও নানা স্থান ঘুরিয়া অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি বলিয়া আফসোস করিলেন। বাস্তবিক তাঁহার আশ্বাসে প্রাণে বড়ই শান্তি আসিল এবং কয়েকদিন পরেই আবার ফেনী আসিব স্বীকৃত হইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। বাড়ীস্থ লোক চট্টগ্রামের ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও কর্তাদেবতাকে বেশ উত্তম মধ্যম দু'চার কথা বলিয়া মনের যোগ শেষ করিলেন।

এদিকে গুরুদয়াল, দুলাল প্রভৃতি জুটিল, পরমানন্দে দিন কাটাইয়া আবার ফেনী যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ফেনী যাত্রা
১৩১০ বাংলা

চট্টগ্রাম যাওয়ার পূর্বেই শ্রীমান লবচন্দ্র পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তাহার জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে 'দয়াময়" নামে দীক্ষিত করা হয়। তারপর চট্টগ্রামেও সে চিঠিপত্র লিখে, কিন্তু তখন মনের ভাবান্তর গতিকে বিশেষ কোন উত্তর প্রত্যুত্তর লেখা হয় নাই। কিন্তু তখন হইতেই দয়াময় তাহার মধ্যে লীলাকার্য আরম্ভ করিয়া আকর্ষণ করেন।

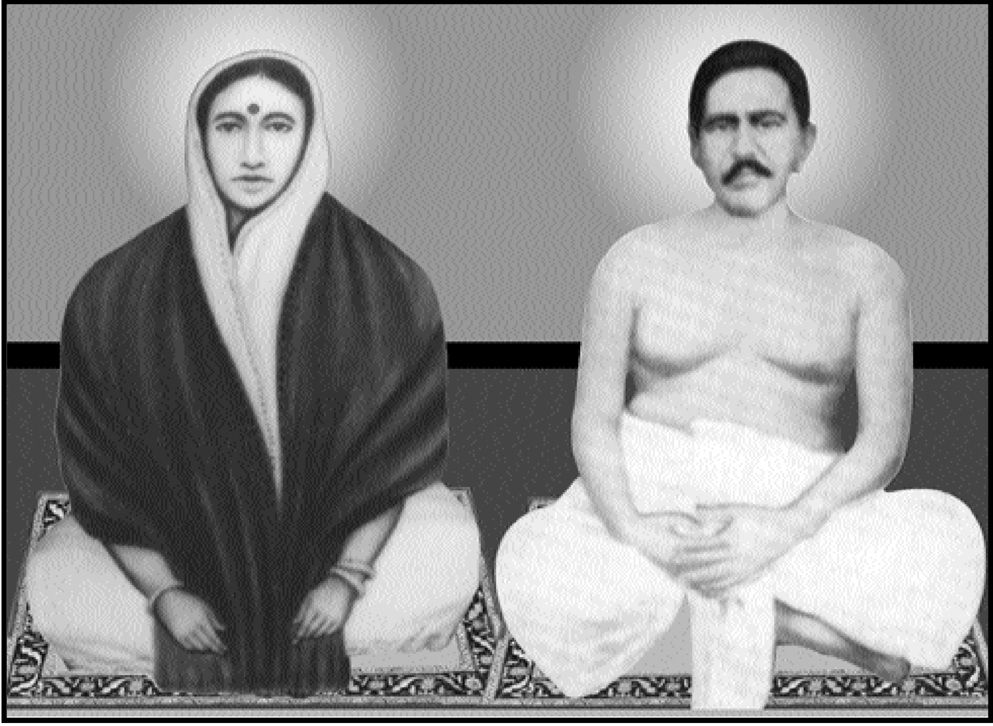
ফাল্গুন মাসে পুনরায় ফেনী যাত্রা করা হয়। ইহার পাঁচ সাত দিন পূর্বে ভূতাইল গ্রাম নিবাসী আলতাবআলীর সঙ্গে অতি গুরুতর তর্ক হওয়ার পর তাহাকে দয়াময় নামে দীক্ষিত করা হয়। গুরুদয়ালের হাতে এদিককার সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ফেনী পহুঁছিলাম। কিন্তু সেখানে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনের ছেলে দু'টিকে পড়ান ভিন্ন কোনও সুবিধা হইতে দেখা গেল না। বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রাণ এমন কোনও ব্যক্তিকে পাইলাম না যাহার নিকট সময় মতে একটু বসিয়া মনের আপসোস মিটাই, কাজেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে একদিন তথায় জগন্নাথ বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলেন ও হস্তস্থিত তানপুরা আমার হাতে দিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি গাহিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন- যে জেলায় ভূবণ রায় এবং গোলমোহাম্মদের বাস, সেই জেলারই লোক গাহিতে পারে না ! তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া আমি অতিমাত্র অবাক হইলাম, পরে অনেক কথার পর বিদায় হইলাম। পরদিন আমার পূর্বে রচিত ব্রহ্মনিরূপক পাঁচ সাতটি সঙ্গীত ও উপনিষদাবলী লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখাইলাম। তিনি সঙ্গীতগুলি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং উপনিষদখানা রাখিবার জন্য বাক চাতুরী ও বিনয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি করিব অগত্যার পর দিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আসিয়া মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইল। কাজেই পরদিন আবার যাইয়া উপনিষদখানা ফেরৎ চাহিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন- আমার তপস্যার ফল তোমাকে দান করিতেছি, তবুও উপনিষদ দিব না। এই সকল কথায় অতি কষ্টে হৃদয় বাঁধিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় আসিলাম। আট দশ দিন পর বিকাল বেলায় বাজার অভিমুখে চলিয়াছি, সম্মুখে দেখি- অনেক লোক একত্রিত হইয়া রহস্যে ব্যাপৃত, ব্যাপারখানা কি দেখিতে নিকটস্থ হইলাম। অমনি তাহাদের রহস্যের অভিনেতা এক যুবক পাগল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে সেলাম জানাইল ও আমার হুকুম চাহিতে লাগিল। দেখিয়া সকল লোক অতিমাত্র আশ্চর্য হইল। আমি পাগলকে সঙ্গে লইয়া একটু আড়ালে

আসিয়া দুই চার কথা বলিয়া সরিয়া পড়িলাম।

ক্রমে চৈত্র মাস শেষ হইয়া গেল। আবার বাড়ী আসিলাম। তখন আলতাব আলী ও ভূতাইল গ্রাম নিবাসী রমজান আলী প্রভৃতি অনেক লোক আসিয়া জুটিল, কয়েকদিন পরমানন্দে কাটাইয়া আবার চলিলাম।

কিন্তু কোনও কাজকর্মের সুবিধা নাই। কেবল আশায় আশায় ঘুরিতেছি মাত্র, মাঝে মাঝে অফিসে যাইয়া কিছু লিখাপড়াও করিয়া থাকি তাহাতে দেখিলাম সকল কর্মচারীই বেজায় স্বার্থপর এবং একান্ত বিষয়ানুরক্ত ! আর কেহ-ই বড় ভাল লেখাপড়া জানে না, কেবল কানে কলম গুজিয়া মুরুব্বির জোরে সরকার হইয়াছে। তাহাতে আবার এত বেজায় অভিমান যে, কথা বলিতেই অহঙ্কার ফুটিয়া পড়ে। এমতাবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সহিত দিন যাইতে লাগিল। তাহাতে একদিন বাসার প্রাঙ্গনে একখানা টুকরা কাগজে 'ওঁ দয়াময়' শব্দটি লিখা দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঁই চাই করিতে লাগিল। মনে ভাবিলাম হতভাগার প্রাণের হরবোলা বুলী এখানে কে লিখিল। প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম- ইহা কে ফেলিয়াছে। জানিলাম- বাসার কর্ত্তার শ্যালক শ্রী নিশি কান্ত সেন। নামটি শুনিয়া প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা হইল যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরি। সে তখন ডিব্রুগড় ছিল, কি জানি অলৌকিক আকর্ষণে ছুটিয়া তাহার পরদিন রাত্রিতে সে একেবারে ফেনী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দে কতকদিন কাটাইতে লাগিলাম ও তাহাকে 'দয়াময়' নামে দীক্ষিত করা হইল।

কিছুদিন ... ... পর ... ...



সাধ্বী জয়দুর্গা দেবী
তিরোধান-১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী
আবির্ভাব-১১ বৈশাখ ১২৩৯ বঙ্গাব্দ
তিরোধান- ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ

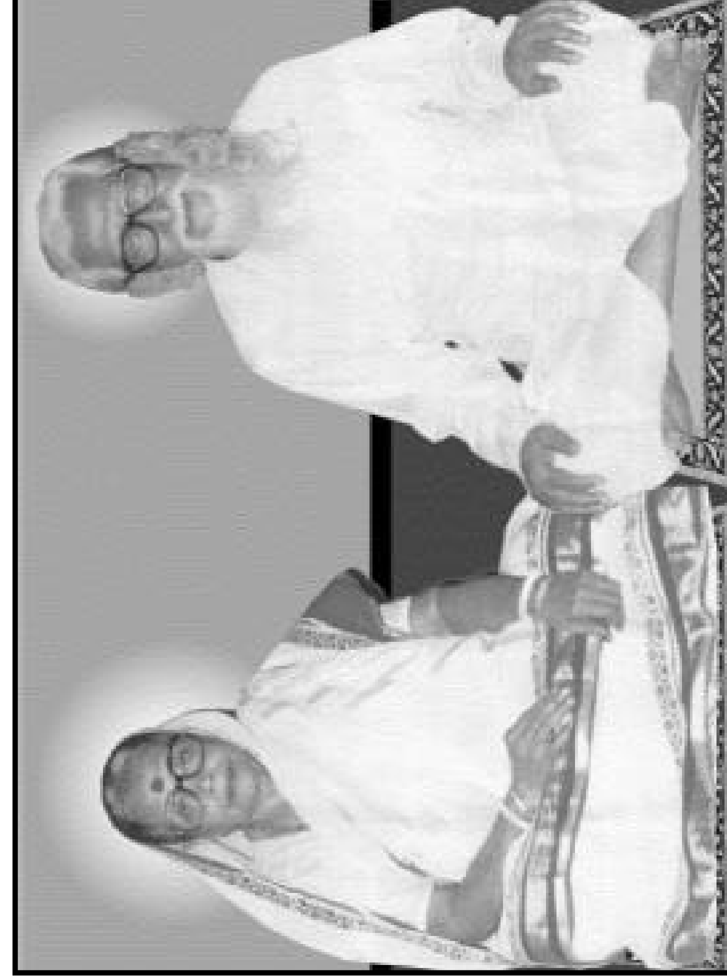


সাধ্বী সৌদামিনী দত্ত
আবির্ভাব- ২৫ মাঘ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ
তিরোধান-২৩ আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত
আবির্ভাব-১০ মাঘ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ
তিরোধান- ২০ আশ্বিন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ



মহর্ষি মনোমোহন দত্ত-এর মাতা ঠাকুরাণী



সাধ্বী কমলা রাণী দত্ত
আবির্ভাব- ২৩ মাঘ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ
তিরোধান- ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীমৎ স্বামী সুধীরচন্দ্র দত্ত
আবির্ভাব-২৭ আশ্বিন ১৩১৫ বঙ্গাব্দ
তিরোধান- ১১ পৌষ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

মহর্ষি মনোমোহন-এর ব্যবহার্য জিনিসপত্র

মনোমোহন-এর হাতে লেখা লীলারহস্য পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীমদাচার্য্য
আনন্দস্বামী ||

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৩০৮ সাল

বিবাহ ॥

[illegible]

[illegible]

১৩০৬ সন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]